প্রথম প্রকাশঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 430
1 May 2017
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্রা

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪৪ তম বর্ষ | ১৭ বৈশাখ ১৪২৩ | ১ মে ২০১৭

মোদীর নির্দেশে লালবাতি ইতিহাস

সাংবাদিকদের ডাক পড়ল কেন্দ্রীয় মন্ত্রির বাড়ি। কোনও ঘোষণা নয়। অনুরোধ, 'গাড়ি থেকে লালবাতি সরানো হচ্ছে। দয়া করে ছবিটি তুলুন'।

হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে রাজধানীর মন্ত্রী মহলে। কে আগে গাড়ি থেকে লালবাতি খুলেছেন— সেটা গণমাধ্যমে চোখে পড়ুক প্রধানমন্ত্রীর। তার কয়েক ঘণ্টা আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছেন, অ্যাম্বুলেন্স, দমকল, পুলিশের মতো জরুরি পরিষেবা ছাড়া আর কোনও ভিআইপি ১ মে থেকে গাড়িতে লালবাতি ব্যবহার করতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী আমলা, বিচারপতি— কেউ নন। তাঁর কথায়, ''সব ভারতীয়ই স্পেশ্যাল, সব ভারতীয়ই ভিআইপি। এই সংস্কৃতি আগেই তুলে দেওয়া উচিত ছিল।'' রাজ্য সরকারও গির হাতে লাল-নীল বাতি ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারির কোনও অধিকার থাকছে না।

এ রাজ্যের মন্ত্রী-আমলারা অবশ্য 'তড়িঘড়ি' কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না। এ রাজ্যে লালবাতি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে পরিবহণ দফতর। দফতরের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ দিন বলেন, ''কেন্দ্রের কোনও নির্দেশ আসেনি। এলে তা মানা হবে তবে এ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো অনেক দিন ধরেই গাড়িতে কোনও 'বেকন আলো' ব্যবহার করেন না।''

মোদীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গডকড়ী বলেন, ''ভিআইপি সংস্কৃতি নিয়ে আমজনতার মনে বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে। তাই ব্যবস্থাটাই তুলে দেওয়া হল।'' এ জন্য কেন্দ্রীয় মোটর ভেইকেলস অ্যাক্ট থেকে সংশ্লিষ্ট ধারাও কি তুলে দেওয়া হল বলেও জানান তিনি। আইনজীবী হরিশ সালভে বলেন, ''লালবাতি-সংস্কৃতি তুলে দেওয়ার দাবি তুলেছিলেন। আদালত মানেনি, কিন্তু আজ সরকার মানল।''

মাস খানেক আগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী

এরপর ২২ পাতায়

আমি সাচ্চা হিন্দু: মমতা

দেবারতি সিংহ চৌধুরী, পুরী

শুধু পুজো দেওয়াই নয়, পুরীতে এসে রাজনীতির তাসও খেলে রাখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনেক দিন ধরেই তাঁর ইচ্ছে ছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার। শেষমেশ আতৃবধূ লতা এবং পূর্তমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলেন তৃণমূল নেত্রী। কিন্তু তাঁর এই পুজো দেওয়াকে উপলক্ষ করে বিজেপি-বিরোধিতার কড়া কিস্তি দিয়ে গোটা বিষয়টিকে কৌশলে রাজনীতির চাল হিসাবেই ব্যবহার করলেন তিনি। বিজেপি-র বিরুদ্ধে সরব হলেন সোশ্যাল মিডিয়াতেও।

প্রতিরোধ উপেক্ষা করে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপি-কে আক্রমণ করে মমতা পাল্টা দাবি করলেন, তাদের থেকেও তিনি বেশি হিন্দু। মমতার কথায়, 'আমিই আসল হিন্দু। বিজেপি হিন্দুত্বের নামে কলঙ্ক।''

দু'দিন আগে ভুবনেশ্বরেই দলের কর্মসমিতির বৈঠকে বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ''পশ্চিমবঙ্গ, কেরল,

এরপর ১০ পাতায়

নারদ কাণ্ডের এফআইআরে আইপিএস মির্জাও - চিন্তা নেই, বলছেন মমতা

কাঠগড়ায় এক ডজন নেতা-মন্ত্রী

ছ'জন সাংসদ, চার জন মন্ত্রী — তার মধ্যে একজন আবার মেয়র। একজন বিধায়ক তথা ডেপুটি মেয়র, একজন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং এক জন আইপিএস অফিসার। নারদকাণ্ডে এই ১৩ জন প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের

অভিযোগ এনে কলকাতার নিজাম প্যালেসে তাঁদের দুর্নীতি দমন শাখায় এফআইআর দায়ের করল সিবিআই। প্রাথমিক তদন্ত চালানোর জন্য আদালতের বেঁধে দেওয়া মেয়াদ ফুরনোর পরেই দিনেই। সিবিআই সূত্রের দাবি, তাঁদের দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতে এই ১৩ প্রভাবশালীর যে কাউকে, যে কোনও সময়ে গ্রেফতারের করা হতে পারে। নবান্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবশ্য প্রতিক্রিয়া, ''এটা রাজনৈতিক খেলা। আমরা রাজনৈতিক ভাবে এর মোকাবিলা করব।''

সে অর্থে দেখলে, ভিডিও ফুটেজে নেতা মন্ত্রীদের যে অঙ্কের টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, সেটা বিশাল কিছু নয়। তা হলে তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারায় অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কেন দায়ের করল সিবিআই? পাশাপাশি দুর্নীতি দমন আইনের ৭, ১৩(১) ১৩(২) ধারাতেও মামলা রুজু করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রের বক্তব্য, এখানে টাকা নেওয়ার উদ্দেশ্যটাই বড় করে দেখা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এই প্রথম নয়, অভিযুক্তেরা এ ভাবে টাকা নিতেই অভ্যস্ত। এবং অর্থের বদলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভ্যাসও তাঁদের রয়েছে। বস্তুত, নারদ কাণ্ড-কে রাজ্যের মন্ত্রী-নেতাদের দুর্নীতির একটি কণামাত্র বলেই চিহ্নিত করেছেন সিবিআই অফিসারেরা।

ভিডিও ফুটেজে সরাসরি টাকা নিতে দেখা যায়নি রাজ্যসভার সাংসদ মুকুল রায় এবং 'পুরমন্ত্রী ফিরহাদ (ববি) হাকিমকে। তা সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হল কেন? সিবিআই সূত্রের খবর, সম্পাদিত ও অসম্পাদিত ভিডিও এবং অডিও টেপ নিয়ে এক মাস ধরে কাটাছেঁড়া হয়েছে। সেখানে থেকে পাওয়া এক একটি বাক্য নিয়েরীতিমতো গবেষণা হয়েছে। তারপর এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে তাঁরাও এই দুর্নীতির অংশ।

ভিডিও ফুটেজে যে সব তৃণমূল নেতার দেখা মিলেছিল, তাঁদের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারীর নাম এফআইআরে নেই। সিবিআই সূত্রের বক্তব্য, প্রাথমিক তদন্তের পরে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ উঠে আসেনি যাতে এটা মনে

এরপর ১০ পাতায়

সীমান্ত বিবাদে ঘৃতাহুতি! ছটি এলাকার নয়া নামকরণ

অরুণাচল দক্ষিণ তিব্বত, জানিয়ে দিল চিন

বেজিং: অরুণাচল প্রদেশকে ফের তাদের ভূখণ্ড দাবি করে ভারতের সঙ্গে বিবাদমান সীমান্ত বিতর্কে ঘৃতাহুতি দিল পড়শী রাষ্ট্র চিন। শুধু তাদের ভূখণ্ড বলে দাবি নয়, এবার অরুণাচল প্রদেশের ছটি স্থানের 'সরকারি ভাবে নামকরণও করেছে বেজিং। বলা বাহুল্য, তিব্বতি ধর্মগুরু দলাই লামার সাম্প্রতিক অরুণাচল সফরের প্রতিবাদেই এই প্ররোচনামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে চিন।

তাৎপর্যের বিষয় হচ্ছে, বেজিংয়ের আপত্তি উপেক্ষা করে দলাই লামাকে অরুণাচল সফরের অনুমতি দিয়েছিল নয়াদিল্লি। আর এ ঘটনার পর দিনই, অর্থাৎ গত ১৪ এপ্রিল অরুণাচলের ছটি এলাকার নামকরণ করা হয়। চিনা অসামরিক বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্ধৃতি দিয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে দেশটির সরকার পরিচালিত অন্যতম অগ্রণী দৈনিক পত্রিকা গ্লোবাল টাইমস।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ১৪ এপ্রিল দেশের অসামরিক বিষয়ক মন্ত্রক 'দক্ষিণ চিনের' ছটি এলাকার তিব্বতি ও রোমান হরফে চিনা ভাষায় নয়া নামকরণ করেছে। রোমান হরফে অরুণাচলের এই ছ'টি স্থানের নয়া নাম হল—ওগ্যানগিং, মিলারি, কইডেনগার্বো রি, মেইনকুকা, বুমো লা এবং নামকাপুব রি।

প্রসঙ্গত, ৩৪৮৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যে সীমান্ত এলাকা নিয়ে ভারত এবং চিনের মধ্যে এই বিবাদ, সেটিকে 'লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল' (এলএসি) বলা হয়। চিন অরুণাচলপ্রদেশকে তাদের ভূখণ্ড দাবি করে এটিকে 'দক্ষিণ তিব্বত' নামেই অভিহিত করে। অপরদিকে দিল্লির দাবি, আকসাই চিন এলাকাটি ভারতের ভূখণ্ড, যা ১৯৬২ সালের যুদ্ধের সময় চিন অবৈধ ভাবে দখল করে।

এবার অরুণাচলের ছ'টি এলাকার নামকরণ করে বেজিং ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদকে উসকে দিতে চাইছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সৌজন্যে— যুগশঙ্খ

নেট বাজারে বিশ্বের দুয়ারে এ বার তন্তুজ

হাতে বোনা তাঁতের শাড়িতে বাজি ধরেই নেট দুনিয়ার অন্য সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে দৌড়ে এগিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ।

বিশ্বের এক নম্বর ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজনের হাত ধরে এ বার আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো-সহ দশটি দেশের পৌঁছবে রাজ্য সরকারি সংস্থা তন্তুজের শাড়ি। অ্যামাজন গ্লোবাল সেলিং প্রোগ্রামে হস্তচালিত তাঁত-বস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম রাজ্য। ২০১৬ সালে ১০,৮০০ কোটি ডলার ব্যবসা করা সংস্থা অ্যামাজনের দাবি, পণ্যের গুণমানের কারণে বিশ্ব বাজারে তন্তুজকে ব্র্যান্ড হিসেবে বিপণন করা যাবে সহজেই।

নতুন ব্যবসা ও ক্রেতা টানতে নেট দুনিয়ায় আগেই পা রেখেছে তন্তুজ। অনলাইনে উপস্থিতি বাড়াতে নিজেদের ওয়েবসাইট ছাড়াও ফ্লিপকার্ট ও অ্যামাজন ইন্ডিয়ায় পণ্য সাজিয়েছে তন্তুজ। তবে তা সীমাবদ্ধ ছিল দেশের বাজারের মধ্যেই। বদলে যাওয়া চাহিদার দিকে তাকিয়েই নেট বাজারে জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। অনলাইন মাধ্যমে ২০১৬-১৭ সালে ৬৫ লক্ষ টাকার ব্যবসা করেছে সংস্থা। এ বছর অনলাইন মাধ্যমে এক কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে সংস্থা। নেট বাজারের জন্য পণ্যের নকশা ও রঙের ক্ষেত্রেও রকমফের এনেছে তন্তুজ। বিদেশের বাজারে অ্যামোনিয়া মুক্ত রং ব্যবহার করা হচ্ছে বলে সংস্থার দাবি।

১৯৮৫ সালে তৈরি সংস্থা তন্তুজ সবে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। মূলত বাজারের চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলা ও বিপণনের জোরে ধুঁকতে থাকা এই সংস্থা ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি করছে সংশ্লিষ্ট মহল। তাঁত, তসর, সিল্কের শাড়ি ও অন্যান্য পণ্য বিক্রি করে ২০১৬-'১৭ সালে তন্তুজ ১৫৩ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে বলে দাবি স্বপনবাবুর। চলতি আর্থিক বছরের শেষে এই ব্যবসা ২০০ কোটি টাকা ছুঁয়ে যাবে বলে আশা তাঁর।

অন্য দিকে বিশ্ব বাজারে নিজেদের বাজার দখল বাড়াতে অ্যামাজন ভারতে তৈরি পণ্যের দিকে নজর দিচ্ছে। অ্যামাজন ইন্ডিয়ার অন্যতম কর্তা গোপাল পিল্লাই জানান, অ্যামাজন গ্লোবাল মঞ্চে ২০ হাজার ভারতীয় বিক্রেতা রয়েছেন। আমুল, বিবা, টাইটান, সিবার্তি মতো নামী ব্র্যান্ড থাকলেও তৃণমূল স্তরের উৎপাদক এখনও কম। পিল্লাইয়ের দাবি, সরাসরি আরও বেশি কারিগরের কাছে পৌঁছে যেতে চায় সংস্থা। সে ক্ষেত্রে দালালের রমরমা কমবে। সংস্থা ও কারিগর, দু'তরফের লাভের পরিমাণ বাড়বে।

অ্যামাজনের দাবি, হস্তচালিত তাঁত পণ্যের চাহিদা বিশ্বজুড়েই রয়েছে। সেই বাজার ধরতে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, নাগাল্যান্ডের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে তারা। হস্তশিল্পের বিপুল চাহিদার দৌলতে লাভের মুখ দেখছে ই-কমার্স সংস্থাগুলিও। তার মধ্যে হাতে গোনা তাঁতের জিনিসের কদর বিপুল। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, স্ন্যাপডিলের মতো বড় সংস্থার পাশাপাশি কারিগরদের হাত ধরতে ঝাঁপিয়েছে ক্রাফিগান, গো-কোপ, বাম্বু ক্রিয়েশন-এর মতো স্টার্ট-আপ বা নতুন সংস্থাও। প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকার হস্তশিল্পের বাজার নেট দুনিয়ায় টানতে কারিগরদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা যে লাভজনক, তা নিয়ে নিঃসংশয় বিভিন্ন ই-কমার্স সংস্থা।

সৌজন্যে— আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮/০৪/১৭

খুঁটিনাটি

অর্থবর্ষ	তন্তুজের ব্যবসা	নেট মারফত
২০১৪-'১৫	১০১.৭০	শূন্য
২০১৫-'১৬	১২৩.২০	শূন্য
২০১৬-'১৬	১৫৩.০০	৬৫ লক্ষ টাকা

হিসেব কোটি টাকায়

অ্যামাজনের গ্লোবাল সেলিং

মোট ভারতীয় বিক্রেতা	২০ হাজার
ভারতে তৈরি পণ্য	৪.৫ কোটি

আবার কংগ্রেসের হাত ধরতে চান সূর্য-বিমানরা

বিধানসভা ভোটে বাম ও কংগ্রেসের জোটের ভরাডুবির পর সিপিএমের পলিটব্যুরো বলেছিল, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট দলের রাজনৈতিক লাইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

গত বছর মে-র ঘটনা। এক বছর কাটিতে না কাটিতেই যেন রাজনৈতিক লাইন' ভেঙে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর দাবি তুলল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। তিন দিনের পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শুরু হয়েছে। সূর্যকান্ত মিশ্রের নেতৃত্বে বঙ্গ-ব্রিগেড মূলত ৩ টি দাবি তুলেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামনে। এক, যে-যে রাজ্যের যে পুরসভাগুলিতে ভোট রয়েছে, সেখানে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে চান তাঁরা। দুই, অগস্টে রাজ্যসভায় সীতারাম ইয়েচুরির মেয়াদ শেষ হলে, কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে যেন তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঠাতে দেন। তিন, আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট।

পলিটব্যুরোর এক নেতা বলেন, "বাংলার নেতারা যে এক দাবি তুলবেন, জানাই ছিল। এখন প্রশ্ন হল, এ কে গোপালন ভবনের সাড়া মেলে কি না!" এ কে গোপালন ভবনের অর্থ, প্রকাশ কারাট ও তাঁর অনুগামীরা। যাঁদের প্রশ্ন, কেন বারবার রাজনৈতিক লাইন ভেঙে পশ্চিমবঙ্গকে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ছাড়পত্র দেওয়া হবে? কেনই বা দলের প্রথা ভেঙে দু'বারের বেশি ইয়েচুরিকে রাজ্যসভায় পাঠানো হবে? বিশেষত ইয়েচুরি যখন দলের সাধারণ সম্পাদক, তখন তাঁর সংগঠনেই বেশি মন দেওয়া উচিত। কারাট শিবিরের এক নেতা বলেন, "আলিমুদ্দিনের নেতারা সাধারণ সম্পাদককে যেন রাজ্যসভায় পাঠানোর বিনিময়ে তাঁর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ছাড়পত্র আদায় করে নিতে চাইছেন। এটা চলবে না।"

বাংলার নেতারা অবশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের ব্যাপারে অনড়। কারাট শিবিরের বক্তব্য, জোট না করে আলিমুদ্দিনের উচিত সংগঠন মজবুত করা ও নিজস্ব ভোট ব্যাঙ্ক বাড়ানো।

ইয়েচুরি শিবির যদিও তা মানছে না। তাঁদের যুক্তি, সংগঠন মজবুত করার সময় চলে যাচ্ছে না। কিন্তু আশু রণকৌশল হিসেবে বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ জোট দরকার। তা বাস্তবায়িত করতেই ইয়েচুরিকে সংসদে দরকার।

সৌজন্যে— আনন্দবাজার পত্রিকা

মমতার কাছে কান্না সুদীপের

দেবারতি সিংহ চৌধুরী: ভুবনেশ্বর

লোকসভায় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, তাঁরা ন্যায়-বিচারের অপেক্ষা করছেন। সুদীপবাবুর মতো প্রবীণ সাংসদকে অসুস্থ অবস্থায় যে ভাবে চার মাস আটকে রাখা হয়েছে, সেই দশা থেকে তাঁরা মুক্তি চান।

মঙ্গলবার রাতে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দরে নেমেই মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি পৌঁছন অ্যাপোলো হাসপাতালে। যার চার তলায় ৪০৩ নম্বর স্যুইটে রয়েছেন সুদীপ আর ৪০২ নম্বর কেবিনে রোজভ্যালি-কাণ্ডে ধৃত তৃণমূলের অন্য সাংসদ তাপস পাল। দু'জনকেই দেখতে গিয়েছিলেন মমতা। তবে সুদীপবাবুকে ঘিরে মমতার আবেগ ছিল দৃশ্যতই বেশি। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মমতা বলেন, 'সুদীপদা কখনও কোনও অন্যায় করেনি। লোকটিকে চার মাস ফেলে রাখা হয়েছে! শরীর ভাল নয়, ১৭-১৮ কেজি ওজন কমে গিয়েছে। আমাকে দেখে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন।" সুদীপবাবু মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বলেও এ দিন জানিয়েছেন মমতা।

তৃণমূল সূত্রে খবর, প্রবীণ সাংসদ সুদীপবাবুর ভগ্নস্বাস্থ্যকে সামনে রেখে তাঁর জামিন মঞ্জুরের জন্য এক সর্বাত্মক চেষ্টা হবে। তৃণমূল নেতৃত্বের যুক্তি, সুদীপবাবুর মতো রাজনীতিক এমন অসুস্থ অবস্থায় কোনও ভাবেই 'পালিয়ে' যাবেন না। তাই তাঁর জামিন মঞ্জুর হলে তদন্তের কোনও ক্ষতি হবে না। সুদীপবাবুর অসুস্থতা এতটাই গুরুতর যে, কলকাতা থেকে মমতা তাঁর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে দেখতে গিয়েছেন—এই বার্তাও কৌশলে সামনে রাখা হবে।

জেল হেফাজতে থাকা সুদীপবাবুর সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর সাক্ষাতের জন্য বিশেষ আদালতের সম্মতি নেওয়া হয়েছিল। দু'জনের কথোপকথনের সময়ে কেবিনে ছিলেন সিবিআইয়ের তিন অফিসার। ছিলেন ওড়িশা সিআইডি-র আধিকারিকেরাও। বিমানবন্দরে নেমে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে রাত পৌনে ৯টা নাগাদ হাসপাতালে পৌঁছন মমতা। হাতে নোটবুক-পেন নিয়ে ভিতরে ঢুকে যান তিনি। বলেছেন, বন্দিদশার যন্ত্রণার কথা লিখে রাখতে।

সূত্রের খবর, মমতা আসার পরে সুদীপবাবুর চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ডাক্তারদের ডেকে নেওয়া হয়। আসেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরাও। সুদীপবাবু তখন সোফায় বসে। দলনেত্রীর হাত ধরে আবেগমথিত হয়েই তিনি বলেন, অনেক দিন এখানে হয়ে গেল। জানতে চান, মমতা কত দিন থাকবেন ভুবনেশ্বরে? মমতা আবার তাঁর কাছে জানতে চান, হাসপাতালে চিকিৎসা বা অন্যান্য বিষয়ে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না। তবে সোফায় পাশাপাশি বসে সুদীপ-মমতার বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা হয়েছে। ঘরে অন্য কারও পক্ষে যা ভাল করে জানা সম্ভব হয়নি।

সুদীপবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে তাপসের কেবিনে মিনিট সাতেক ছিলেন মমতা। কৃষ্ণনগরের সাংসদও বসেছিলেন সোফায়। তাঁর কাছেও তৃণমূল নেত্রী জানতে চান, শরীর কেমন? হাসপাতালে কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না? তাপসও দলনেত্রীকে বলেছেন, দীর্ঘদিন আটকে থাকার যন্ত্রণার কথা। দলনেত্রীর কাছে কান্নাকাটি করেছেন তাপসও। আর মমতার পরামর্শ, তাঁরা ভেঙে পড়লে বাইরে থেকে তাঁর লড়াইও কঠিন হয়ে যাবে। তাই মন শক্ত রাখতে হবে। এ দিন সব মিলিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিট হাসপাতালে ছিলেন মমতা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মমতা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তবে সুদীপবাবুকে গ্রেফতারের দিন তাঁর গলায় কান্না ছিল, তা এ দিন দেখা যায়নি। ভুবনেশ্বরে এসে তিনি শুধু বলেছেন, সুদীপবাবু চেয়েছিলেন তিনি এক বার আসুন। তাই তিনি এসেছেন। পুজো দেবেন পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেও।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯/৪/১৭)

ধীরে বহে রাইন

পরাগরঞ্জন গুহ

পাঁচ বছর আগে ১৫ দিনের ইউরোপে ট্যুরে গিয়েছিলাম। ডায়েরির পাতা থেকে শুধু জার্মানিতে একদিনের অভিজ্ঞতার কথা বলব। দশ আগস্ট, ২০১২, নেদারল্যান্ডস-এর আইন্ডহোভেন থেকে অপূর্ব সব দৃশ্য দেখতে দেখতে দু'ঘণ্টার পথ পেরিয়ে আমরা জার্মানির কোলনে পৌঁছলাম। এখানে প্রথম রাইন-এর সাথে দেখা। প্রথমেই আমার কোলন ক্যাথিড্রালে এলাম। ট্যুর ম্যানেজার জানালেন এখানে প্রার্থনা করলে নাকি বৃথা যায় না। সিলিং ও দেওয়ালে কী অপূর্ব সব কাজ, চোখ জুড়িয়ে যায়। আমরা সবাই প্রার্থনা মঞ্চের সামনে এসে মোম জ্বালিয়ে যে যার মতো করে প্রার্থনা করলাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির বোমার আঘাতে কোলন নাকি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শুধু এই ক্যাথিড্রাল একা দাঁড়িয়েছিল সব বোমার আঘাত সহ্য করে। এই ক্যাথিড্রাল ৫১৫ ফুট উঁচু cathedral গথিক স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। শহর দেখে আমরা রাজমহল রেস্তোরাঁয় এলাম লাঞ্চ করতে। এখানে যে ইউরোপ ভ্রমণের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল কে জানত। হোটেলের মালিক। আহাম্মদ আলম বাংলাদেশি, ঢাকা বিক্রমপুরের লোক, আর তাঁর স্ত্রী নাজমা সিলেটি। শুনে বলি ডাকুন তাঁকে। এগিয়ে এলে বলি, আইন তে ওবায়, মানে এদিকে আসুন। বেশ কিছু কথার পর বলেন আপনে দেখি পাক্কা সিলেটি মাতইন—মানে আপনি তো বেশ সিলেটি বলেন। হেসে বলি—পারতাম না কেনে, আমি নু শিলঙের মানুষ—মানে কেন পারব না আমি তো শিলং-এর লোক। প্রসঙ্গক্রমে বলি শিলংয়ের স্থানীয় বাঙালিরা সিলেটি ডায়ালেক্টেই কথা বলেন। সুদূর জার্মানির কোলনে আমি নাজমার সাথে সিলেটিতেই কথা বলেছিলাম। বিস্ময়ের তখনও বাকি ছিল। নাজমার দাদা সফরুল এসে জিগ্যেস করেন রান্না কেমন লাগল বউদি? আমরা খুব ভালো পেয়েছি শুনে জিজ্ঞেস করেন আর কিছু লাগবে? আমার স্ত্রী বলেন একটু পান পেলে ভালো হতো। আরে আগে বলবেন তো, দাঁড়ান আমার দিদি পাশেই থাকে, পান এনে দিচ্ছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাজানো পান, সুপারি ও জর্দা নিয়ে এসে হাজির। সুদূর জার্মানিতে এরকম ঘটনা ঘটেছিল। এ যে পরম প্রাপ্তি।

কোলন থেকে আমরা Boppard বলে রাইন নদীর ধারে একটি ছোট্ট শহরে চলেছি, যেখানে আমরা রাইন নদীতে ভ্রমণ করব। জার্মানিতে ইউরোপের প্রথম ও শেষ ট্রাফিক জ্যাম-এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল হাইওয়েতে। হাইওয়েতে কোথাও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর আমরাও আটকে আছি। সবাই খুব টেনশনে আছি, আদৌ আজ ক্রুজ ধরতে পারব কি না জানি না। আমাদের বোটটি যদি একবার মিস হয়ে যায়, তাহলে কিছু করার থাকবেনা। কারণ এসব দেশে সময়মতো না পৌঁছলে কিছু করার থাকেনা। আমাদের যাবার পর Koeblenz বলে রাইন নদীর ধারে পাহাড় ঘেরা এক অপূর্ব ছোট শহর পার হয়ে Boppard এলাম। এ যেন ফ্রেমে বাঁধানো এক পিকচার পোস্টকার্ড। এই Boppard শহর রাইন-এর দু'ধারে ছড়িয়ে আছে। জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট ও ফ্রান্সের মাউন্ট Vosges-এর মধ্যে সৃষ্টি হওয়া এক রিফ্ট ভ্যালির মধ্যে দিয়ে রাইন এখানে বয়ে চলেছে। রাইন ক্রুজের এক আকর্ষণ হল পাহাড়ের গায়ে পুরনো সব দুর্গ। এছাড়া Boppard শহরে ও ঐতিহাসিক দুর্গ আছে যার মধ্যে Alte Burg বা পুরনো দুর্গ, শহরের এক ল্যান্ডমার্ক। যে কারণে Boppard-এ রাইন ভ্যালিকে 'ভ্যালি অব দ্য কিংস' বলা হয়। অনেক ক্রুজ লাইনার Boppard থেকে St. Goar পর্যন্ত যাতায়াত করে। প্রায় দেড় দেড় ঘণ্টার মতো এই ক্রুজে মধ্য যুগের জার্মানির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মেলবন্ধন এমন কিছু মুহূর্ত তৈরি করে, যা সারা জীবন মনে রাখার মতো। ইউনেসকো Boppard-কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

তীর্থক্ষেত্র কেদারনাথে

সঞ্জয় ভৌমিক

ছোট থেকেই মা-ঠাকুমার মুখে তীর্থক্ষেত্র হিসাবে কেদারনাথের নাম আমরা সকলেই শুনেছি। অনেকেই বলেন ঠাকুর ডাকলে কপালে নাকি বাবার দর্শন মেলে। পায়ে হেঁটে প্রায় ২২ কিমি পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। এই রাস্তা কিন্তু খুব মসৃণ নয়। কিন্তু একবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলে নিজের জীবন সার্থক বলে মনে হবে। রাস্তার দু'পাশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য আপনার মনকে ভরিয়ে তুলবে। আর যাঁরা পাহাড় ভালোবাসেন তাঁরা এই হাতছানিতে সাড়া দিতে বাধ্য। তাই আর দেরি না করে ঘুরে আসুন কেদারে। কেদারনাথ মন্দির হিন্দুদের অন্যতম তীর্থস্থান। এটি ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গাড়োয়াল হিমালয় পর্বতশ্রেণিতে অবস্থিত কেদারনাথ শহরে মন্দাকিনী নদীর তীরে অবস্থিত একটি শিবমন্দির। প্রতিবছর বহু পুণ্যার্থী তীর্থ করতে এখানে আসেন। তীব্র শীতের কারণে সারাবছর মন্দিরটি খুলে রাখা সম্ভব হয় না। শুধুমাত্র অক্ষয় তৃতীয় (এপ্রিল মাসের শেষ) থেকে কার্তিক পূর্ণিমা (নভেম্বর মাসের প্রথম) অবধি এই মন্দির খোলা থাকে। শীতকালে কেদারনাথ মন্দিরের মূর্তিগুলিকে উখিমঠে নিয়ে গিয়ে পুজো করা হয়। এই স্থানটির নাম প্রাচীনকালে রাজা কেদারের নাম থেকে কেদারখণ্ড ও কালক্রমে তা কেদারনাথ হয়ে ওঠে। অন্যমতে, স্থানীয় ভাষায় কেদার শব্দটির অর্থ হল শিব। সেই থেকে এর নাম কেদারখণ্ড বা শিবের জায়গা, যা বর্তমানে কেদারনাথ নামে পরিচিত। তবে ২০১৩ সালের ১৬ জুন হঠাৎ আসা হড়পা বানে সব কিছু তছনছ হয়ে যায় শুধুমাত্র মন্দির ছাড়া। মন্দাকিনী ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রায় ৬ হাজার প্রাণ। আহতের সঠিক হিসাব আজও পাওয়া যায়নি। নিখোঁজ হয়ে যায় বহু মানুষ। বন্যার ধসে বয়ে যায় সব রাস্তাঘাট। সরকারের উদ্যোগে আজও চলছে রাস্তার কাজ। হড়পা বানের ভয়াবহ স্মৃতি ভুলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে কেদারনাথ আর গৌরীকুণ্ড।

উত্তরাখণ্ড রাজ্যের রাজধানী দেরাদুন থেকে কেদারনাথ-এর দূরত্ব প্রায় ১১০ কিমি। গৌরীকুণ্ডকে কেদারনাথ-এর প্রবেশদ্বার বলা হয়। গৌরকুণ্ড থেকে কেদারনাথ এর দূরত্ব মাত্র ১৬ কিমি। পুরোটাই হাঁটা পথ। গৌরীকুণ্ড থেকে রামওয়াড়া অবধি সাত কিমি পথ এখনও অক্ষত। সেখানে নদীর ওপর নির্মিত লোহার ব্রিজ পার হয়ে উল্টোদিকে পাহাড়ে আসার পর নতুন রাস্তার শুরু। নতুন রাস্তা ধরে কেদারনাথ মন্দির প্রায় সাড়ে দশ কিমি। রামওয়াড়ার ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নীচে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখে মনে ভীতি জন্মাবে। কেদার ও গৌরীকুণ্ডে কিছু জনপদ বেঁচে থাকলেও রামওয়াড়া নামক জায়গাটি পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই চোদ্দো কিমি জুড়ে আগে দু'হাত অন্তর ছিল সরাইখানা, চা, কোল্ডড্রিংকস, রুটি, পরোটা, সিঙ্গারা-র দোকান আর এখন শুধু নদীগর্ভ থেকে উঠে আসা গর্জন আর কিছু ট্যুরিস্টের আনাগোনা। তবে কাজ যা হচ্ছে তা তারিফযোগ্য। কোথাও সিমেন্ট, কোথাও বা লোহার বিম লাগানো হচ্ছে। কয়েকশো মিটার অন্তর নতুন মেকশিফট বায়ো টয়লেট তৈরি হয়েছে। দু'পা পর পর পানীয় জলের বন্দোবস্ত হয়েছে। মন্দিরের চারিদিকে এখন দোকানের হুড়োহুড়ি। মন্দিরের পিছনে শঙ্করাচার্যের সমাধিটাও রক্ষা পায়নি। কিন্তু বারোশো বছরের পুরনো মন্দিরটি এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দির থেকে দু'কিমি উপরে চোরাবালিতাল থেকে মন্দাকিনীর খাত ধরে নেমে এসেছে বড় বড় পাথর আর কালো করে দিয়েছে গোটা বসতি। তবে ধীরে ধীরে নতুন আধুনিক সাজে সেজে উঠছে কেদারনাথ। তাই জীবনে অন্তত একবার পায়ে হেঁটে কেদার দর্শনের অভিজ্ঞতার স্বাদ সবার নেওয়া উচিত।

কীভাবে যাবেন হাওড়া থেকে উপাসনা এক্সপ্রেস ও দুন এক্সপ্রেস ধরে চলে যান হরিদ্বার। সেখান থেকে বাস বা গাড়ি ভাড়া করে ২৩৫ কিমি যাত্রা করে গৌরীকুণ্ড। সেখান থেকে হাঁটা শুরু। গৌরীকুণ্ড থেকে প্রায় সাড়ে ১৭ কিমি পথ হেঁটে উঠতে হবে। এছাড়া গৌরীকুণ্ড থেকে ১৬ কিমি আগে ফাটা। সেখান থেকে হেলিকপ্টার হাড়ে যা কেদার বেস ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়। যাতায়াত ভাড়া ৭০০০ টাকা। সেখানে থেকে মন্দির দেড় কিমি হাঁটা পথ। মে থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত হল যাওয়ার উপযুক্ত সময়।

কোথায় থাকবেন শোনপ্রয়াগ, গৌরকুণ্ড, ত্রিযুগী, লিনচোলি, কেদার বেসক্যাম্প সব জায়গায় জিএমভিএন কটেজ আছে। এগুলি অনলাইনে বুক করা যায়। ভাড়া শুরু ১০০০ টাকা থেকে।

অবশ্যই চেষ্টা করবেন শোনপ্রয়াগে মেডিক্যাল টেস্ট ও বায়োমেট্রিক কার্ড সংগ্রহ করবেন কারণ সেটিই হল কেদার যাওয়ার ছাড়পত্র।

খাওয়া-দাওয়া এমনিতে পাহাড়ি অঞ্চলে ম্যাগিবা খিচুড়িইভরসা। কিন্তু এই অঞ্চলের কিছু নিজস্ব খাওয়া-দাওয়া আছে যার স্বাদ সুযোগ পেলে অবশ্যই নেবেন। স্থানীয় গাড়-গাড়ড়া এবং মশলা ব্যবহারের ফলে এখানকার খাবার এক অন্য মাত্রা লাভ করে থাকে। যেমন ধরুন নীচের খাবারগুলো এদের মধ্যে আপনি ঐতিহ্যগত স্বাদের স্বাদ পেতে পারেন মেথির এবং তিল লাড্ডু, মাণ্ডুয়া রুটি, হরিয়া রুটির সাথে দুধভাস, গাহাত (কুলাথ) সুপ, গাহাত রুশমি বড়ি (লোপথা), উরদ কি পাকোড়া (বড়া) ভাঙ্গ জিরা কি চাটনি, আলু কে গুটকে, চানসু, আফুলি আলু, তিল কি চাটনি, বাল মিঠাই, সিনগোড়ি, ভানগজ খাজাই, সিঙ্গোরি শাক, ঝাঙ্গোরা কি খীর, আপ্পা, গাহাত কি ডাল এবং সিঙ্গারা।

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL EXECUTIVE COMMITTEE

President
Milan Awon

President Elect
Dilip Chakrabarti

Vice-Presidents
Debi Prosad Palit
Tapas Sanyal

Treasurer
Ranadeb Sarkar

Secretary
Arnnava Sinha

Assistant Secretary
Dhriti Bagchi

Members
Sugata Bagchi
Adris Chakraborty

BOARD OF TRUSTEES

Chairman
Kajal sarkar

Members
Chitta Saha
Pranab Das
Arun Bhattacharya
Asok Motayed
Samprakash Majumdar
Purna Bhattacharya
Kumar Sankar Mandal
Asoke Dey Sarkar

বিড়াল

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

মন ভাল থাকলে একা-একা গুনগুন করে বিড়াল। কুমার শানুর গান বিড়ালের সব চেয়ে পছন্দ। এখনও 'সাজন' ছবির একটা গান উঁচু করে গাইতে গাইতে হাঁটছে বিড়াল। শীতের রাতের কলকাতা পুরো নিঝুম। আজ ঠান্ডাটাও পড়েছে কষে। মানুষজনের নিশ্চয়ই আজ বেশি শীত পাচ্ছে।

শীত পায় নাকি? মনে পড়তেই হেসে ফেলল বিড়াল। 'কবে পেল শীত?' 'কে-কে শীত পেল?' 'কী পেল শীত?' এমন হাজারটা প্রশ্ন করে ঘুঘুকে নাজেহাল করে দিত ও। ঘুঘুর ঠান্ডা বেশি। গরম কালে বৃষ্টি পড়লেও বলে, 'ওঃ আমার খুব শীত পাচ্ছে।'

ঘুঘুর জন্য সব করতে পারে বিড়াল। আঠেরো বছর আগে ঘুঘুকে একবার দেখেই সেই যে 'পিছলিপ' করে প্রেমে পড়েছিল, তার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। তবে ঘুঘু যে ওকে একদম ভালবাসে না, সেটা পরিষ্কার করে দিয়েছে। বলেছে, 'দূরে থাক, দূরে থাক। কাছে আসবি না। আমার অন্য ছেলেকে পছন্দ। তুই কে? কী অধিকার তোর? দূর হ!'

তা দূরেই থাকে বিড়াল। তার মধ্যেই যখন একটু কথা বলার সুযোগ পায় তখন হাসি-ঠাট্টা করে। খেলায়। তারপর আবার দূরে সরে যায়। আর মনে মনে প্রস্তুতি নেয়।

পগাদা বলেছে, বাঁশদ্রোণীর কাছে একটা গ্যারেজ স্পেস দেখে দেবে। সেখানে মোমোর দোকান দেবে বিড়াল। বাঙালি এখন উন্নত হয়ে গিয়েছে। রোল আর রোচে না। মোমোর মধ্যে বেশ একটা অ্যান্টি ছাঁদের ব্যাপার আছে। বাঙালির পছন্দ। তা ছাড়া, ঘুঘুও মোমো পছন্দ করে।

দোকানটার জন্য পগাদা বলেছে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা লাগবে। বহুত টাকা। এখনও পর্যন্ত বিড়াল পৌনে চার মতো জমিয়েছে। কাজে মন না দিলে ঘুঘুর বাচ্চারা এসে ওর দোকানে মোমো খাবে।

দূর থেকে বাড়িটা দেখতে পেল বিড়াল। কলকাতায় এমন বাড়ি এখন আর চট করে দেখা যায় না। চারদিকে পাঁচিল ঘেরা, সামনে বাগানওয়ালা বাড়ি। আশেপাশের লম্বা হিলহিলে দীপিকা পাড়ুকোনের মতো ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর মাঝে এ যেন সেভেন্টিজের হেমা মালিনী।

দাদু বলেছে, 'যাবি, কাজ সেরে বেরিয়ে আসবি। আশেপাশের কেউ বাগড়া দেবে না!'

কথাটা ঠিক। এই শীতের রাতে কার ঠেকা পড়েছে এসে বাগড়া দেওয়ার।

যে কোনও অপারেশনে বিড়াল একাই বেরোয়। দাদু ওর স্যার। গোটা দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে ঘুরে বেড়ায় দাদু। খোঁজ নেয়, কোন ফ্ল্যাট খালি আছে। কোন বাড়িতে কে বেড়াতে গিয়েছে। কার বাড়িতে কত দিন লোক থাকবে না। আর এসে সেই সব খবর দেয় বিড়ালকে।

'বিড়াল' নামটা দাদুই দিয়েছে ওকে। ওর ফর্সা, বেঁটে চেহারা আর বিড়াল-চোখ দেখে প্রথম দিনই দাদু বলেছিল, 'শালা এ তো পুরো বিড়াল!'

কথাটা ভুল নয়। শুধু দেখতে নয়, ওর হাবভাবও বিড়ালের মতো। যে কোনও জায়গা বেয়ে উঠতে পারে ও। দোতলা থেকে পড়ে গেলেও বিশেষ ব্যথা-ট্যাথা লাগে না! জানলা, স্কাইলাইট, দেওয়াল বা বেড়ার ছোট্ট ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে অনায়াসে।

গত বারো বছর এ লাইনে আছে বিড়াল। আজ পর্যন্ত এক বারও পুলিশের হাতে পড়েনি।

কিন্তু সত্যি বলতে কী, এমন চুরি-হ্যাঁচড়ামি করতে ওর মন চায় না। তাই তো পগাদাকে বলছে ওই দোকানটার কথা। পগাদা বলেছে ওর জন্য আরও মাস ধরে রাখবে গ্যারেজটা। তার মধ্যে টাকার জোগাড় না-করতে পারলে পগাদাকে যেন আর সে দোষ না দেয়।

দোষ কাউকেই দেয় না বিড়াল। ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়ে এক রকম অনাথের মতো মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছে।

দাদুই ওকে নামিয়েছে এই লাইনে। রীতিমত ভোকাল টনিক দিয়ে, ইতিহাস ঘেঁটে, চুরিও যে মহান শিল্প আর বিশাল নামওয়ালা অনেক মানুষ যে এই কাজ গর্বের সঙ্গে করেছে ও করছে, সব বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে এই সব শারীরিক গুণাবলি ভগবান বিড়ালকে সুপারহিরো হওয়ার জন্য দেয়নি।

কিন্তু তাও এটা ভাল লাগে না বিড়ালের। দাদুর কথা মতো এটা যদি শিল্পই হয়, তা হলে হাততালি দেওয়ার লোক থাকে না কেন। ওরও তো ভাল মানুষ হতে ইচ্ছে করে। একদিন একটা দারুণ ভাল মানুষের মতো কাজ করতে ইচ্ছে করে! পেটের দায়ের চেয়ে মনের দাবিটাকে এক দিন বেশি গুরুত্ব দিতে ইচ্ছে করে!

শুনশান বাড়িটা দেখে থাবার বদলে জিভ চাটল বিড়াল। এ বাড়িতে যা পাবে তাতে মনে হয় না আর কোনও দিন ওকে এই কাজ করতে হবে। ঘুঘুর সামনে গিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে।

গতকালও বিকেলের দিকে একবার এই বাড়িটার সামনে এসে ঘুরে গিয়েছে বিড়াল। দাদু ওকে বলে দিয়েছে, বাড়ির মেন গেটটায় ইয়েল লক লাগানো রয়েছে। টেনে লাগালে বন্ধ হয়ে যায়। বাইরে থেকে চাবি ছাড়া খোলার উপায় নেই। তাই বিড়ালকে ঢুকতে হবে বাড়ির পিছনের দিকে দিয়ে। একটা স্কাইলাইট আছে। কাচের। সেটা ভেঙে ঢুকতে হবে। এক বার ঢুকে গেলে জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরে দরজা খুলে ভাল মানুষের মতো বেরিয়ে আসতে সমস্যা নেই।

বিড়াল চারদিক দেখে নিল একবার। তার পর দেওয়াল টপকে টুপ করে বসে পড়ল বাড়ির চৌহদ্দিতে।

পাথর ফেলা শৌখিন রাস্তা! চারিদিকে গাছপালা। তার মধ্যে দিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত এগিয়ে গেল বিড়াল।

কাচের জানলাটা ভাঙা কোন সমস্যাই হল না। একটা মোটা কাপড় হাতে জড়িয়ে সামান্য জোরে মারতেই কাচটা ভেঙে গিয়েছে। কাচের ফ্রেমের থেকে বাকি কাচের টুকরো সরিয়ে শরীরটাকে সরু করে গলিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে তেমন বেগ পেতে হল না বিড়ালকে।

ছোট্ট একটা টর্চ জ্বালিয়ে এদিক এদিক দেখল বিড়াল। বড় আলো জ্বালানো যাবে না বাইরের থেকে কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, তবেই বিপদ। ওর কাছে তালা খোলার 'মাস্টার-কি' আছে। কিন্তু সদরের তালা খুলতে গেলে বেশ কিছুক্ষণ গেটের সামনে বসে কাজ করতে হত। শীতের রাত, আশেপাশে সব নিঝুম হলেও সেটা রিস্ক হয়ে যেত। তাই এ ভাবে ঘরের পিছনের জানলা দিয়ে ঢোকাই ভাল।

এটা বাথরুম। ছোট্ট একটা টর্চ জ্বালিয়ে এদিক ওদিক দেখল বিড়াল। বড় আলো জ্বালানো যাবে না বাইরের থেকে কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, তবেই বিপদ। ওর কাছে তালা খোলার 'মাস্টার-কি' আছে। কিন্তু সদরের তালা খুলতে গেলে বেশ কিছুক্ষণ গেটের সামনে বসে কাজ করতে হত। শীতের রাত, আশেপাশে সব নিঝুম হলেও সেটা রিস্ক হয়ে যেত। তাই এ ভাবে ঘরের পিছনের জানলা দিয়ে ঢোকাই ভাল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল বিড়াল। টর্চের আলোয় চারিদিকটা দেখে মনটা আবার ভাল হয়ে গেল। মনে হল 'পরদেশ' ছবির সেই 'দো দিল মিল রহে হ্যায়' গানটা শানুর গলাতেই গেয়ে ওঠে। সারা ঘরেই সুন্দর জিনিসে ভর্তি। টিভিটা এত বড় যেন একটা জানলা। ওঃ, আলমারিটা খুলতে পারলে কী না জানি পাওয়া যাবে!

আন্দাজে আন্দাজে শোওয়ার ঘর কোনটা হবে ভেবে সামনে এগিয়ে গেল বিড়াল। করিডরটা সরু হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। সেটা দিয়ে গিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়েই চমকে উঠল ও। সামনের ঘরটায় আলো জ্বলছে আর সেখানে এক জন বয়স্ক মানুষ লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ভীষণ ঘাবড়ে গেল বিড়াল। আরে বাড়িতে যে কেউ আছে, সেটা দাদু বলেনি তো! ছুরি-টুরি সঙ্গে রাখে না বিড়াল। কিন্তু আজ এই অবস্থায় কী করবে ভেবে না পেয়ে কোমরে গোঁজা স্ক্রু-ড্রাইভারটা বের করে সামনে বাগিয়ে ধরল।

বয়স্ক লোকটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মাথায় মাংকি টুপি। গায়ে ঢোলা বাদামি সোয়েটার। পরনে লুঙ্গি। লোকটা ওকে দেখে কাঁপা গলায় বলল, 'তু...তুমি কে বাবা! চোর!'

'আপনি কে?' বিড়াল সাহস আনল। সামনে লোকটা বেশ থুত্থুরে প্রাচীন। লাঠিতে ভর করে কাঁপছে। এত বড় বাড়িতে এমন বুড়োকে কেউ একা রেখে যায়! আজকাল ছেলে-মেয়েরা অমানুষ সব। লোকটা বলল, 'বাবা আমার শরীর খুব খারাপ... আমার... সুগার ফল করছে... আমি...'

লোকটা কথা শেষ না করেই আচমকা পড়ে গেল মাটিতে। বিড়াল দেখল, লোকটা [illegible] করে ঘেমেছে। হাত-পা কাঁপছে। 'জল... জল...' বলে হাত বাড়াচ্ছে।

কী ঝামেলা! বিড়াল ভাবল পালাবে কি না। কে বুড়ো, কোথাকার বুড়ো, তার জন্য বেকার ঝামেলা নেবে কেন?

কিন্তু তার পরেই মত বদলাল। এত বয়স্ক লোক, কেউ নেই! ফিট করে ফেলেছে। একে এ ভাবে ফেলে রেখে যেতে মন চাইছে না। সেই দারুণ ভাল মানুষের মতো কাজটা আজকেই করতে ইচ্ছে করছে!

'দাদু, দাদু!' স্ক্রু-ড্রাইভারটা কোমরে গুঁজে এগিয়ে গেল বিড়াল। ঝুঁকে পড়ে লোকটার হাত ধরল, 'উঠতে পারবেন?'

'নার্সিং হোম। কাছেই... আমি যাই ওখানে... আমি.. প্লিজ হেল্প.. ভয় নেই.. প্লিজ...' মানুষটা অস্ফুটে বলল।

সর্বনাশ একে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে। এখন! কিন্তু লোকটা যে ভাবে নেতিয়ে পড়ছে, তা ছাড়া তো উপায়ও নেই! 'ও দাদু!' বিড়াল ঠেলল, 'আপনি উঠতে পারবেন?'

লোকটা চোখ খুলল সামান্য, মাথা নাড়ল। তার পর কষ্ট করে হাতটা তুলে আলমারি দেখিয়ে বলল, 'টাকা... নার্সিং হোম... টাকা...'

স্বাভাবিক। ভর্তি করতে হলে তো টাকা লাগবেই।

'চাবি কই দাদু? ও দাদু!' বিড়াল দেখল, লোকটা আবার নেতিয়ে গিয়েছে। চোখও খুলছে না। কী জ্বালা। ফেঁসে গেল নাকি। দাদু। একবার পেলে বাপের বিয়ে দেখিয়ে ছাড়বে। শীতের মধ্যেও ঘেমে গেল বিড়াল। লোকটার নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। না, নিশ্বাস পড়ছে। কিন্তু অজ্ঞান। কী করবে ও এখন!

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল বিড়াল। তারপর পকেট থেকে মাস্টার-কি বের করে এগিয়ে গেল আলমারির দিকে। ওর টেনশন হচ্ছে, কিন্তু ভালও লাগছে জীবনে আজ প্রথম আলমারি ভাঙছে কোনও ভাল কাজে। ঘুঘুর মুখটা মনে পড়ে গেল ওর। কোনও ভাল কাজ করলেই ঘুঘুর কথা মনে পড়ে বিড়ালের। অবশ্য খারাপ কাজ করলেও পড়ে।

মিনিট চারেকের চেষ্টায় আলমারিটা খুলে ফেলল বিড়াল আর খুলেই চমকে গেল। ওরে বাবা, পাঁচশো টাকার বান্ডিল। তিনটে দেড় লাখ। ও এক বার বুড়োর দিকে তাকাল। নেতিয়ে আছে মানুষটা। ঠোঁট কামড়ে ভাবল একবার, পালাবে?

'আঃ।' লোকটার জ্ঞান ফিরল।

পাশে রাখা প্লাস্টিকের ব্যাগে টাকাগুলো ভরল বিড়াল। না, এই অবস্থায় চুরি করা যায় না।

'নার্সিং হোম... আমার জামা কাপড়...' লোকটা হাত তুলল।

বিড়াল দেখল, আর একটা ব্যাগ রাখা আছে পাশে। সময় নষ্ট না করে দ্রুত খাটের ওপর রাখা কিছু জামাকাপড় ব্যাগে ভরে ও তাতে টাকার প্লাস্টিকটাও ঢোকাল। নার্সিং হোমে লাগবে তো!

'চলুন।' বৃদ্ধকে হাত ধরে তুলল বিড়াল। দেড় লাখ টাকা ভর্তি ব্যাগটা তুলে গলায় ঝোলাল। এখন শুনশান রাতের রাস্তায় ট্যাক্সি পেলে হয়।

আজ ভগবান সঙ্গে আছে বিড়ালের। নড়বড়ে লোকটাকে কোনও মতে ধরে রাস্তায় এনে দাঁড়াবার একটু পরেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। কাউকে ছাড়তে এসেছিল। তবে একটা হলুদ ট্যাক্সি নয়। এখনকার ফোন থেকে বুক করা স্টাইলিশ ট্যাক্সি।

লোকটা ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেই গাড়ি থামিয়েছে।

নার্সিং হোম কিছু দূরে। বয়স্ক মানুষটা কেমন নিঃসাড়ে পড়ে আছে পিছনের সিটে। মারা গেলে বিশাল কেস খাবে বিড়াল।

গাড়িটা নার্সিং হোমের বাউন্ডারির সামনে দাঁড় করিয়ে দ্রুত নামল বিড়াল। শুনশান রাস্তা। শুধু একটা মাতাল এক পাশে বসে ঝিমোচ্ছে।

মনে মনে বিড়াল ঠিক করে নিয়েছে, লোকজন ডেকে এনে বুড়োকে ওদের হাতে দিয়ে কেটে পড়বে। ও কে, কী ভাবে চিনল বুড়োকে, এ সব প্রশ্ন এলেই মুশকিল। তা ছাড়া বুড়ো বিপাকে পড়ে ওর সাহায্য চাইছে। অজ্ঞান হয়ে যে ওকে পুলিশে দেবে না, তার গ্যারান্টি নেই।

গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে একটু বুড়োকে দেখতে বলে নার্সিং হোমে ঢুকল বিড়াল। সব ঘুমোচ্ছে। রিসেপশনে শুধু একটা ছেলে ফোন নিয়ে নিচু গলায় হাসি মুখে গুটুর-গুটুর করছে।

'এমারজেন্সি, তাড়াতাড়ি!'

বিড়ালের হাঁকডাকে চারটি ওয়ার্ড বয় স্ট্রেচার নিয়ে ট্যাক্সির দিকে দৌড়ল ওর সঙ্গে। লোকটাকে ওরা যখন স্ট্রেচারে তুলবে, সেই ফাঁকে ও চোঁ-চোঁ দৌড় দেবে। রুগিকে তো আর ফেলে দেবে না ওরা। তা ছাড়া, টাকা তো আছেই ব্যাগে।

সামান্য এগোতেই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আসতে দেখল বিড়াল।

লোকটা দূর থেকেই উত্তেজিত গলায় বলল, 'আরে এত দেরি করছেন। দাদু তো হেঁচকি তুলছেন।'

সেরেছে। সকলে গাড়ির দিকে ছুটল।

বিড়াল গাড়ির সামনে গিয়ে সময় নষ্ট না করে দরজা খুলে ফেলল। কিন্তু তার পরেই থমকে গেল। বাকিরাও দাঁড়িয়ে পড়ল ওর পিছনে। এটা কী দেখছে ও? গাড়ির ভিতরটা ফাঁকা। কেউ নেই। শুধু লাঠিটা পড়ে আছে। বয়স্ক মানুষ দেড় লাখ টাকার ব্যাগ, কিচ্ছু নেই। এটা কি ম্যাজিক।

বিড়াল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এটা কী হল।

আশেপাশে তাকাল বিড়াল। মাতাল লোকটা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শুধু। আর কী অবাক, মাতালটির মাথায় ওই বুড়োর মাংকি টুপি।

মাতালটা হাসছে, জড়ানো গলায় বলছে, 'দাদু বলল, চুরি শিখেছ, অভিনয় শেখোনি খোকা।'

রাত নিশুত হচ্ছে কলকাতায়। মাতালের হাসির টুকরো ব্লিজারের মতো গেঁথে যাচ্ছে ওর শরীরে। কুমার শানুর কোনও গান মনে পড়ছে না আর। শুধু শীত পাচ্ছে খুব। আজ এই রাতে দাঁড়িয়ে বিড়াল বুঝতে পারছে, শীত পাওয়া আসলে কাকে বলে।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা

সেই ট্রাডিশন এখনও চলছে

নতুন বছরে প্রকাশকের ঘরে লেখকদের এন্তার খাওয়াদাওয়া আর এলাহি আড্ডায় ব্যবসার হিসেবনিকেশে নয়, বাঙালির বইপাড়া এ দিন ধরা দেয় আত্মীয়তার বাঁধনে। — অময় দেব রায়

সন ১৩৬৫। পয়লা বৈশাখ। ভোলানাথ দেপার হাউসে যুবক ভানুর সঙ্গে দাদাঠাকুরের হঠাৎ দেখা। দাদাঠাকুর বললেন, 'টাকাপয়সা যা পাওনা আছে আজই উসুল করে দে।

তবে চলুন আমাদের অফিসে।' 'কোথায়? গজেনের ওখানে?'

'হ্যাঁ, কলেজ স্ট্রিট।'

'চল তবে।'

'একটা ট্যাক্সিডাকি দাদাঠাকুর?'

'আবার ট্যাক্সি কেন?'

'ও মা! এতটা পথ হাঁটবেন ট্যাক্সি লাগবে না!'

'আমি দুটো দা একটা কুড়ুল নিয়ে চলি রে হতভাগা। ওতেই যথেষ্ট। ট্যাক্সির দরকার পড়ে না।'

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের তখন বিপুল জনপ্রিয়তা। কলকাতা শহরে সবাই এক ডাকে চেনে। পাশ থেকে একজন বললেন, দুটো দা, একটা কুড়ুলের মানেটা ঠিক বুঝলাম না দাদাঠাকুর।

'ডাকছিস তো দাদাঠাকুর, মানে বুঝতে পারলি না! 'দাদা'তেই দুটো 'দা' আছে। আর 'ঠাকুর'-এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একখানা আস্ত 'কুঠার'।' বলে পা চালিয়ে হাঁটা লাগালেন। খালি পা, চটি-জুতোর কিছু নেই। একখানি সাদা ন্যাতা ধুতির মতো করে জড়ানো। চোখে মোটা ফ্রেমের গোল চশমা। দাদাঠাকুর ছুটছেন।

'মিত্র ও ঘোষ' পাবলিকেশন তখন চাঁদের হাট বসেছে। সজনীকান্ত দাস, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, কে নেই? দাদাঠাকুরকে দেখতেই সকলে উঠে দাঁড়ালেন। দরাজ গলায় গান ধরলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত। 'কলকাতা কেবল ভুলে ভরা/ হেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে/ বোকায় পড়ে ধরা/ হায় রে কলকাতা কেবল ভুলে ভরা...'

দাদাঠাকুর আসতেই আড্ডা যেন দ্বিগুণ জমে উঠল। গানে, গল্পে, কথায় সন্ধে গড়িয়ে তখন রাত ন'টা। সজনীকান্ত দাস বললেন, 'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে দাদাঠাকুর, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'এত করে বলছিস যখন চল। তুই তো অনেক পাপ করেছিস। নাহয় খানিক খণ্ডাবি।'

'আমি আবার কী পাপ করলাম দাদাঠাকুর?'

'ওই যে তোর পত্রিকায় সবাইকে ধরে-ধরে বধ করিস।'

কথা শুনে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আপনি ঠিক বলেছেন দাদাঠাকুর। ও ব্যাটা আমাকে একুশ বার বধ করেছে!'

সে দিনের আড্ডার একমাত্র জীবিত সাক্ষী যুবক ভানু এখন তিরাশির প্রবীণ সবিতেন্দ্রনাথ রায়। সরকারি চাকরির সুযোগ পেয়েও সাহিত্যের আড্ডার টানে প্রকাশনা ছাড়তে পারেননি। কলেজ স্ট্রিটের অনেক বদল হয়েছে। ধীরে-ধীরে জৌলুস হারিয়েছে নববর্ষের আড্ডা। চোখের সামনে ইস্টার্ন পাবলিশার্স, এ মুখার্জি, বাণীমন্দিরের মতো অনেক পাবলিকেশন হাউসের ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে। তবু [illegible] ভানুবাবু। আজও প্রকাশনাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। বলছিলেন, তখন নববর্ষ মানেই ফুলের গন্ধে ম-ম করত কলেজ স্ট্রিট। দিন পনেরো আগে থেকেই শুরু হয়ে যেত তোড়জোড়। আর ছিল পাত পেড়ে খাওয়াদাওয়া। রীতিমত ঠাকুর আনিয়ে রান্না হত পাবলিকেশন হাউসগুলিতে। অনেকে মিষ্টিটাও কারিগর ডেকে তৈরি করে নিতেন। লেখকেরা রকমারি স্বাদের লেখা নিয়ে দফতরে দফতরে ঘুরে বেড়াতেন। কপিরাইটের বালাই ছিল না। যার যেটা পছন্দ সরাসরি কিনে নিতেন। কোনও-কোনও লেখকের সঙ্গে এই দিন বার্ষিক চুক্তি হত। সারা বছর লেখা দেওয়ার বিনিময়ে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা।

১৩৮৫-র পয়লা বৈশাখ। সে বার এক অদ্ভুত কাণ্ড। কিছুদিন আগে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। নববর্ষে 'মিত্র ও ঘোষ' থেকে 'পরমপুরুষ পরমহংস' বইটির চারটি খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হবে। ভোরবেলা কালীঘাটে পুজো দিয়ে সবে দোকানে ঢুকেছেন সবিতেন্দ্রনাথ রায়। তখনও এগারোটা বাজতে অনেক দেরি। কাউন্টারে এসে ধূপধুনো জ্বালাতে গিয়ে দেখেন, জনা পনেরো কুড়ি লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখনও তো এগারোটা বাজেনি। এত সকাল-সকাল লাইন দিয়েছেন কেন?' সকলের এক উত্তর, পরে যদি স্টকে বই না পাই। তাই আগেভাগেই দাঁড়িয়ে পড়লাম।' 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' তাঁদের চাই-ই চাই। এগারোটার মধ্যে লাইন সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়ে গেল। এত ভিড় ভানুবাবু কল্পনাও করেননি। এ দিন ধরে মাত্র তিন হাজার কপি। ঠিক হল, প্রত্যেকে এক কপি করে বই পাবে। অমনি পুস্তকবিক্রেতারা গোল বাধালেন। তাঁদের অন্তত দশ কপি বই চাই। শেষমেশ রফা হল, পুস্তকবিক্রেতারা ৫ কপি, সাধারণ ক্রেতারা পাবেন ১ কপি করে। দুপুর একটার মধ্যে তিন হাজার কপি শেষ। কিছুক্ষণ বাদে আরও তিন হাজার বই এল। বিকেল পাঁচটাতেই লাইন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ক্রেতাদের হইচই কিছুতেই থামে না। এ দিকে কাউন্টার ফাঁকা। আর একটিও বই নেই। বিপদ বুঝে কোলাপসিবল গেট বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন সবিতেন্দ্রনাথ। বাধ্য হয়েই সে বার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় খবর দিতে হয়েছিল। পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয়। নইলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। নববর্ষে বইয়ের জন্য থানাপুলিশ রূপকথার গল্পের মতো শোনালেও তখন সেটাই ছিল ঘোর বাস্তব।

গল্পে-গল্পে 'খেয়ালখুশির খাতা' মেলে ধরলেন সবিতেন্দ্রনাথ রায়। ১৩৭০ সনে এই খাতা লেখার সূচনা করেন প্রমথনাথ বিশী। তারপর 'মিত্র ও ঘোষ'-এর নববর্ষের আড্ডায় যাঁরাই এসেছেন, প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লিখে দিয়েছেন। প্রমথনাথ বিশী প্রথম পাতায় দু'লাইনের কবিতা লিখেছিলেন, 'আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম। সেদিন শোনার তাহা, কবিত্বের সম।' খাতাটি বহু অমূল্য স্মৃতির ভাণ্ডার। বনফুল, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, বিমল মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সহ ১৪০ জন লেখকের কলমের আঁচড় ছড়িয়ে আছে পাতায় পাতায়।

এ রকমই এক পাতায় ১৩৮৬-র নববর্ষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'খুব জমিয়ে কিছু লিখব ভাবছিলাম। গত একটি বছরের হিসেবনিকেশ নেব। এমন সময় সহাস্যে শঙ্কর হাজির। হিংসেয় আমার কলম থেমে গেল।' শঙ্করের জবাব, 'যিনি আশুতোষ তিনিই শংকর সুতরাং নিজেকে নিজেই বাধিয়ে রাখার প্রচেষ্টা কেন?' তার ঠিক নীচেই গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের উত্তর, 'আশুতোষের হিংসে নিকেশ করে নিয়েছেন শঙ্কর। এক্ষেত্রে গৌরীশঙ্করের জন্য বাকী আর কি থাকে।' তবে লেখকের সকলেই একটি বিষয়ে একমত, 'মিত্র ও ঘোষ'-এর নববর্ষের আড্ডায় চন্দ্রপুলি সন্দেশের স্বাদ এক বার যার জিভে লেগেছে, তিনি আজীবন মনে রাখবেন।

১৩৮৮-র ৩ বৈশাখ। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম পাতার শিরোনাম 'শংকর প্রকাশকের লক্ষ্মী' সঙ্গে সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের হাফ পেজ ছবি। দে'জ প্রকাশিত শংকরের ট্রিলজি 'স্বর্গ-মর্ত্য পাতাল' সে বার শততম সংস্করণে পৌঁছয়। প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে বলছিলেন, সে বার নববর্ষে সকাল থেকে রাত অবধি দফতরে হাজির ছিলেন শংকর। উপচে পড়া ভিড়। সবাই বই কিনে বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন শংকরের হাতে। হাসিমুখে সকলের আবদার মিটিয়ে বইয়ে সই দিয়েছিলেন লেখক। সেলফি-কুল আসেনি, লেখকের সই-ই তখন নববর্ষে পাঠকের সেরা প্রাপ্তি।

'মিত্র ও ঘোষ' এর যেমন 'খেয়ালখুশির খাতা', দে'জ এর তেমন লাল খাতা। একটা দুটো নয়, সাতটি লাল মলাটের খাতা। একের পর এক তাক থেকে বেরোচ্ছিল সেই সব যখের ধন। এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। কিন্তু কিছুতেই পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না। কাহিনি খোলসা করলেন বড় ছেলে শুভঙ্কর দে। 'বোঝা যাবে কী করে! বাবার মুখে শুনেছি, সে বার শক্তি দফতরে এলেন টলমল পায়ে। বললেন, 'মাথাটা ঝিমঝিম করছে, দাও দেখি তোমাদের খাতাখানি।' কী সব হিজিবিজি দাগ কাটলেন। কেউ আর পড়তে পারে না। শেষমেশ গম্ভীর গলায় নিজেই পড়েছিলেন— 'সারা জীবন ধরে কে হাসবে, কে হাসবে বলে এই চিৎকার, ভালোবাসা মন্দবাসা! কে জানে? কে শক্তি। ১ বৈশাখ। ১৩৮৮।' এই না হলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

নববর্ষের কলেজ স্ট্রিট মানে আনন্দ পাবলিশার্সকে বাদ দিয়ে ভাবাই যায়না। পবিত্র সরকার বলছিলেন, 'এক বার বছরকার দিন এলোমেলো ভাবে কলেজ স্ট্রিটময় ঘুরে বেড়াচ্ছি। একজন জানতে চাইলেন, আনন্দ পাবলিশার্সটা কোথায়? উত্তর দিলাম, সোজা এগিয়ে যান, যেখানে দেখবেন প্রচুর ডাবের খোলা ছড়িয়ে আছে, বুঝবেন আপনি পৌঁছে গেছেন।' সে দিন আনন্দতে যে-ই আসুন, ডাবের জল বাঁধা। সঙ্গে এক বাক্স নকুড়ের সন্দেশ। প্রকাশক সুবীর মিত্র জানাচ্ছিলেন, তখন এক একটা নববর্ষ মানেই রথী-মহারথীতে ঠাসা আড্ডা। শক্তি, সুনীল, শীর্ষেন্দু সব গোল হয়ে বসতেন। কখনো ফাঁকে-ফাঁকে খালি গলায় গান ধরতেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। হাবেভাবেই বোঝা যেত তিনি তখন বাংলা সাহিত্যের রাজা।

আর এক নববর্ষ। প্রকাশ পেল 'রাগ-অনুরাগ' রবিশঙ্কর তখন খ্যাতির শীর্ষে। কিন্তু দফতরে যে লোকটি এলেন তিনি একেবারে মাটির মানুষ। সারা দিন ধরে ঘুরিয়ে দেখানো হল গোটা কলেজ স্ট্রিট। অলিগলি খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন, 'নতুন বইয়ের গন্ধ আর একরাশ আনন্দ নিয়ে ফিরছি। আবার আসব।'

শুধু লেখক? প্রচ্ছদশিল্পী, প্রুফরিডার, বাইন্ডার, প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলের দেখা মেলে নববর্ষের দিন। কলেজ স্ট্রিট হয়তো বদলেছে। কিন্তু নববর্ষে আড্ডার ট্রাডিশন বদলায়নি।

সৌজন্যে — আনন্দবাজার পত্রিকা

খাঁটি বাঙালি খাবার পাই কোথা?

মাংসের আলু, ঝালের লঙ্কা, চাটনির টোমাটো, চিংড়ির মালাইকারি সবই তো অন্যদের অবদান। বাঙালির রসনাসংস্কৃতি বরাবরই বহুমাত্রিক। উৎসা রায়

নববর্ষ মানেই খাওয়াদাওয়া। গত কয়েক বছর নববর্ষের কয়েক দিন আগে থেকে কাগজ খুললেই আমরা মূলত দুটি জিনিস দেখতে পাই। নববর্ষে পরতে হবে সাবেক ধুতি-পাঞ্জাবি, শাড়ি। খেতে হবে খাঁটি বাঙালি খাবার। এই খাঁটি বাঙালি খাবার, যেমন মোচার ডালনা, চিংড়ির মালাইকারি, বা রসগোল্লার পায়েস যদি বাড়িতে বানানো যায়, তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু আজকের যুগে সময় পাওয়া যাচ্ছে না এত কিছু করার। কুছ পরোয়া নেহি! রেস্তরাঁ রয়েছে, যেখানে ধুতি-পাঞ্জাবি বা লালপাড় সাদা শাড়ি পরে পুরুষ এবং মহিলারা পরিবেশন করে যাবেন পোলাও ছোলার ডাল, মাছের পাতুরি, চাটনির মতো খাঁটি বাঙালি খাবার।

ভাবতে মজা লাগে, এক সময় বাঙালি রেস্তরাঁয় যেত নতুন খাবারের স্বাদ নিতে। এমন খাবার, গেরস্তের রান্নাঘরে যার প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু আজ নতুনের হাতছানির সঙ্গে রেস্তরাঁয় খাঁটি সাবেকি রান্নাও। দু'জনের খাওয়াতেই মজেছি আমরা। কিন্তু এই যে সাবেক বাঙালি রান্না, তার উপাদান থেকে শুরু করে রন্ধনপ্রক্রিয়া, অনেক কিছুই কিন্তু ব্রিটিশ আমলের দান। এমনকী প্রাক ব্রিটিশ যুগেও এত জনের মিলমিশ শুরু হয়ে গিয়েছে যে 'খাঁটি' বাঙালি খাবার পাওয়া বোধহয় একটু মুশকিল।

সত্যি বলতে, কোনও দেশের রন্ধনশৈলী। আদি-অকৃত্রিম ধারায় অনাদিকাল ধরে চলে আসছে, এ কথা ভাবাই হাস্যকর। মধ্যবিত্ত বাঙালির খাওয়াদাওয়ার ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে দেখেছি, সারা পৃথিবীতে এক ছবি। খাঁটি কেউ নেই। আজ আমরা যে মেক্সিকান রান্না খাই, তার সঙ্গে কি আজটেকদের রান্নার কোন সম্বন্ধ আছে না কি? এই যে 'খাঁটি, অকৃত্রিম' বাঙালি রান্নায় আলু দেওয়া হবে, টমেটো দেওয়া হবে, লঙ্কা দেওয়া হবে, এগুলি বাংলার মাটিতে ফলত না কি?

ঔপনিবেশিক বাংলার যাঁরা রান্নাবান্না নিয়ে লিখেছেন, যেমন প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় বা আর একটু পরের দিকে বীণাপাণি মিত্র, তাঁরা এত অকৃত্রিম বাঙালি খাবার-টাবার নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা যেমন বলে দিচ্ছেন ওমলেট কী করে তৈরি হবে, একই ভাবে টিপসি পুডিং-এরও প্রণালী বলে দিচ্ছেন। প্রজ্ঞাসুন্দরী যেমন একটি রান্নার নামকরণ করলেন 'ফিরিঙ্গি কারি'। এই ফিরিঙ্গি কারি-র মূল উপাদান কী? পটল। বীণাপাণি মিত্র আবার তাঁর বইয়ে আমাদের শেখালেন কীভাবে টফি তৈরি করতে। এই যে ফিরিঙ্গি, তাঁরা কারা? বলবার প্রয়োজন নেই যে বাঙালিরা যাঁদের 'ফিরিঙ্গি' বলে সম্বোধন করে থাকেন, তাঁরা কিন্তু ইউরোপীয় নন, আবার ভারতীয়ও নন। তাঁরা এই দুইয়ের সংমিশ্রণ। অনায়াসেই পটল তাঁদের খাদ্যের একটি উপাদান হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বাঙালিরাও কি শুধুই খাঁটি এবং অকৃত্রিম? আমরা যা খাই, যা পরি, কোনটাকেই বা যে অর্থে সনাতন বলা চলে? এই যে নববর্ষে সবাই রে-রে করে পোলাও খাবেন, তা-ই কি আবার বাঙালি নাকি? সত্যি বলতে কী, এই কোনটাকেই বাঙালি বলতে কোনও বাধা নেই, যদি আমরা স্বীকার করে নিই, বাঙালি জাতির পরিচিতি ধর্ম-বর্ণ-জাত সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা দয়া করে আমার গর্দান নেবেন না। 'ভারতমাতা' ছবির স্রষ্টা স্বয়ং অবন ঠাকুর তাঁর বাবুর্চি [illegible] আলির রান্না মুরগির স্টু খেতে বড় ভালবাসতেন।

আজকে আমরা ঘরে-ঘরে যে চা খাই, সে-ও তো ঔপনিবেশিক আধুনিকতারই দান। চিংড়ির মালাইকারির অস্তিত্ব প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে পাওয়া যাবে কি? সাহেবরাও এ দেশে এসে মহানন্দে খেয়েছেন আম দিয়ে মুরগি, ডালের চচ্চড়ি, সুক্তোর মতো খাবার। দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে— এই না হলে বাঙালি কি ইংরেজ কেউই তৈরি হয় না। বস্তুত, অনেক দোষ সত্ত্বেও বাঙালির রসনাসংস্কৃতি চিরকালই বহুমাত্রিক, আজও।

সৌজন্যে — আনন্দবাজার পত্রিকা

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্কের পারদ

অর্ণব নাগ

উত্তর কলকাতার জোড়াসাঁকো অঞ্চলের অধুনা ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠাকুরবাড়ি এবং সিমুলিয়া পল্লির ৩ গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের দত্তবাড়ির দূরত্ব মেরেকেটে দেড় কিলোমিটার। কলকাতার এই দুই বিত্তশালী বনেদীবাড়িতে একসাথে বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষ বাস করতেন। কিন্তু এই দুই বাড়িকে উত্তরকাল মনে রাখবে বোধহয় একটাই কারণে—যেহেতু এই দুই অট্টালিকার আঁতুড়ঘর উপহার দিয়েছে আধুনিক ভারতবর্ষের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষাকে। এঁরা হলেন, বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ দত্ত (উত্তরকালের বিবেকানন্দ)। বাড়ির দূরত্বের মতোই এঁদের বয়সের ব্যবধানও প্রায় দেড় বছরের। একজনের জন্মসার্ধশতবর্ষ মহাসাড়ম্বরে পালিত হয়ে সদ্য-সমাপ্তির পথে। অপরজনের জন্মসার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্যোগ আয়োজনও সারা। কিন্তু যেটা করতে পারা যায়নি সেটা হল এঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আপামর জনসাধারণের কৌতূহলের নিবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা ইতিমধ্যে হয়েছে। তা নিয়ে রবীন্দ্র-অনুরাগী ও বিবেকানন্দ-অনুগামীদের মধ্যে তরজাও কম কিছু হয়নি তবুও আম-বাঙালির তাতে আশ মিটেছে এমনটা বলা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে। তবে এছাড়াও এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ব্যাপারে বহু পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণাদি রয়েছে। সামগ্রিক পর্যালোচনা করে একটা জিনিস পরিষ্কার মনে হয়—এই দুই মহামানবের সম্পর্কের মাত্রা কখনই এক জায়গায় স্থির থাকেনি, বরঞ্চ এঁদের সম্পর্কের পারদের ওঠানামা বেশ বিচিত্র, কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ কবে হয়েছিল? এনিয়ে প্রত্যক্ষ কোনও প্রমাণ নেই। পারিপার্শ্বিক তথ্যাদির ওপর ভরসা রেখে প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন, "বাংলা জীবনচরিতকারের (বাংলা ভাষায় বিবেকানন্দের জীবনচরিতকার প্রমথনাথ বসু) মতে নরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭-৭৮ এই দুই বৎসর কলকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন। পক্ষান্তরে ১৮৭৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি—এই এক বৎসর পাঁচ মাস রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলাতে। ১৮৭৭-এর পূর্বে এই দুই কুমারের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের সম্ভাবনা খুবই কম। ১৮৮০ ফেব্রুয়ারির পরে উভয়ের যোগাযোগ ঘটে একথা মনে করাই সঙ্গত বোধ হয়।" ('রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবোধচন্দ্র সেন, কথাসাহিত্য, ফাল্গুন ১৩৭০)। বিবেকানন্দের জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দের মতও এইরকম। তবে 'রবিজীবনী'র লেখক প্রশান্তকুমার পালের অনুমান একটু ভিন্ন। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দীপেন্দ্রনাথ (দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র) মেট্রোপলিটান স্কুলে নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। এরকম একটা ধারণা বলবৎ আছে যে দীপেন্দ্রনাথ কলেজ জীবনে বিবেকানন্দের সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথ জায়া হেমলতা দেবী 'পুরানো কথা' ('দেশ', ৩৩ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬)-এ লিখেছেন, "আমার স্বামী (দীপেন্দ্রনাথ) আর বিবেকানন্দ ছিলেন বাল্যবন্ধু। একই সঙ্গে এঁরা জেনারেল এ্যাসেম্বলি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। (হেমলতা দেবীর এই তথ্যটিতে অবশ্য গলদ আছে। বিবেকানন্দ এন্ট্রান্স পাশ করেন মেট্রোপলিটান থেকে। এফ এ এবং বি এ পাশ করেন জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে)।...এনট্রান্স পাশ করে স্বামী আর পড়লেন না, বিবেকানন্দ কলেজে ভর্তি হলেন।"

যাই হোক, এই সূত্রে 'রবিজীবনী'কারের অনুমান, "জানুয়ারি ১৮৭৬ (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩)-র পূর্বেই (নরেন্দ্রনাথ ও দীপেন্দ্রনাথ) সহপাঠী থাকা সম্ভব, কারণ ১৬ জুন (৩ আষাঢ়) দীপেন্দ্রনাথ ও অরুণেন্দ্রনাথকে উক্ত স্কুল (মেট্রোপলিটান) থেকে ছাড়িয়ে এনে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়—নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন সাড়ে বারো বছর। দীপেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান স্কুলে ভর্তি হন জানুয়ারি ১৮৭৫-এ (নরেন্দ্রনাথ তখন সেখানে ফিফথ ক্লাসে পড়ছেন)। সুতরাং তাঁরা প্রায় দেড়বছর একসঙ্গে পড়েছিলেন। এরপরে ১৮৭৭-এ নরেন্দ্রনাথ পিতার সঙ্গে রায়পুরচলে যান এবং ১৮৭৯-এ কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় স্কুলে ভর্তি হয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সুতরাং সহপাঠী দীপেন্দ্রনাথের সূত্রে ১৮৭৫-৭৬-এ তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যাওয়া-আসা করে থাকতে পারেন, রায়পুর থেকে ফিরে আসার পরও এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা।" ('রবিজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, প্রশান্তকুমার পাল)। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের এই যাতায়াতের সূত্রে সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়ে থাকতে পারে। বিশেষত উভয়েই যখন ছিলেন সুগায়ক এবং উভয়ের গায়কীর খ্যাতি সেই অল্প বয়সেই ফেটে পড়েছিল।

তবে এঁদের দু'জনের যোগাযোগের প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছেও নবিংশ শতাব্দীর একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনায়। যেখানে একটি বিবাহবাসরের বাসরে কবিগুরু ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষক আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পরবর্তীকালের কাম-কাঞ্চনত্যাগী বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। এবিষয়ে প্রথম অবহিত করেন ডা. কালিদাস নাগ বাংলা ১৩৬৪ সালে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। 'বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' শীর্ষক প্রবন্ধে ডা. নাগ লিখেছেন, "নরেন্দ্রের দু-বছরের বড় রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিলেত প্রবাস থেকে ফিরেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আদেশ করলেন একটি বিবাহমঙ্গল গীত রচনা করতে, কারণ রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাদেবীর সঙ্গে সঞ্জীবনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ। তাঁদের পুত্র সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে লীলাদেবীর ডায়েরি থেকে আমি পেয়েছি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অনুষ্ঠিত বিবাহসভা; আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী। সেখানে নগেন চট্টোপাধ্যায়, কীর্তনিয়া ডা. সুন্দরীমোহন দাশ, কেদারনাথ মিত্র, অন্ধ চুনীলাল ও নরেন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ সঙ্গীত করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি' এবং 'জগতের পুরোহিত তুমি' ও 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে' প্রভৃতি সঙ্গীত রচনা করিয়া গায়কদিগকে শিখাইয়াছিলেন।"

প্রসঙ্গত, বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতী (জন্ম ১৮৬৪) নিয়মিত দিনপঞ্জী লিখতেন। 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় তাঁর দিনপঞ্জী প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর 'জীবনকথা' গ্রন্থটি এই দিনপঞ্জীর সাহায্যে সম্পূর্ণ করে ১৯২৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশ করা হয়। ('অন্তঃপুরের আত্মকথা', চিত্রা দেব)। ডা. কালীদাস নাগ 'সুকুমার মিত্রের সৌজন্যে লীলাবতীর ডায়েরি থেকে' যা উদ্ধৃত করেছেন তার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে 'লীলাবতী মিত্র' শীর্ষক পুস্তকে বর্ণিত লীলাবতীর বিবাহবাসরের বোড়তি তথ্যের মধ্যে এতে রয়েছে খালি—'১৮৮১ সালের ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয়।' এবং 'শাস্ত্রী মহাশয়ের আরাধনা, উপদেশ, বিবাহমন্ত্র ও সুবিখ্যাত গায়কদের (যাদের মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম) সঙ্গীত শুনিয়া কয়েক ব্যক্তি এমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অবিলম্বে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।' এই বইটি কার লেখা সে নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'লীলাবতী মিত্র' নামক এই বইটির আখ্যাপত্রটি বিনষ্ট। ক্যাটালগে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, ১৫২ পৃষ্ঠার সচিত্র বইটি সাদা বোর্ডে বাঁধা। বইটির লেখক কিংবা সম্পাদক অথবা প্রকাশক হলেন উপেন্দ্রনাথ দাস। বইটি কবে প্রকাশিত হয়েছিল তার উল্লেখ কোথাও নেই। প্রবোধচন্দ্র সেন 'লীলাবতী মিত্র' বইটি 'সম্ভবত কৃষ্ণকুমারের সহায়তায় তাঁর কন্যা কুমুদিনীর রচনা' বলে অনুমান করেছেন। ('রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ')।

যাই হোক, বইটির একটি অংশে 'লীলাবতী মিত্রের জীবনকথা' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে জানা যাচ্ছে, "১৮৮৯ হইতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই দীর্ঘ ৩৫ বৎসরের লিপি হইতে কেবল কয়েকটি কথা প্রকাশ করা হইল।' সহজবোধ্য কারণেই ১৮৮১ সালে নিজের বিবাহবাসরের কথা লীলাবতী মিত্রের 'জীবনকথা'য় ঠাঁই পায়নি। তবে তথ্যটির সত্যতা নানা সূত্রে সমর্থিত একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আসলে এহেন অতীব বিস্ময়কর তথ্যটির নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহের অবতারণা করতে হল।

এই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই সমসাময়িক দুই যুবক রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্কের পারদ যে ক্রমশই ঊর্ধ্বমুখী হয়েছিল তা অনস্বীকার্য। সুগায়ক ও সঙ্গীতপ্রেমী স্বামী বিবেকানন্দের একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি 'সঙ্গীত কল্পতরু' নামে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থের সম্পাদনা। বইয়ের শুরুতে সহকারী প্রস্তুতকার বৈষ্ণবচরণ বসাক তাঁর 'বিশেষ কথা'য় লিখেছেন, "প্রায় এক বৎসর অতীত হইল ইহার সঙ্কলনকার্য আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীযুক্তবাবু নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ. মহাশয়ই প্রথমত ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন; কিন্তু পরিশেষে তিনি নানা অবশ্যম্ভাবী কারণে অবসর না পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই তজ্জন্য আমিই ইহার অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।" (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, স্বামী গম্ভীরানন্দ)। বইটির প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ধৃতি দিয়েছেন গম্ভীরানন্দ, "স্বামীজী ছিলেন না শুধুই গীতিশিল্পী, ছিলেন সঙ্গীত-তত্ত্বানুসন্ধানেরও পথচারী... সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থখানির ঔপপত্তিক আলোচনা শৈলীই তাঁর সঙ্গীত জ্ঞান-বিচক্ষণতার কথা প্রমাণ করে।" (তদেব)

এহেন 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে রবীন্দ্রনাথের গোটা দশেক গান ঠাঁই পেয়েছে। গ্রন্থের 'সঙ্গীত-সংগ্রহ' অংশে, 'জাতীয় সঙ্গীত' পর্যায়ভুক্ত গানগুলি হল, 'অয়ি বিষাদিনী বীণা আয় সখি', 'তোমারি তরে মা সঁপিনু', 'আবরে জগৎ মেলিয়া নয়ন' (এই গানটির প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল সংযোজিত তথ্য—সরোজিনী নাটকের 'জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটির শেষ ১৪টি ছত্র, স্বভাবতই 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামাঙ্কিত), 'ভারতরে তোর কলঙ্কিত পরমাণু রাশি', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'। ধর্ম বিষয়ক সঙ্গীতের মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীতের তালিকায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি—'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে', 'দুই হৃদয়ের নদী, একত্রে মিলিল যদি' এবং শ্যামাসঙ্গীত হিসেবে 'কালী কালী বলোরে আজ'। এছাড়া 'সঙ্গীত-কল্পতরু'তে 'প্রণয় সঙ্গীত' হিসেবে 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' ('ভানুসিংহ ঠাকুর' নামাঙ্কিত) এবং 'বিবিধ সঙ্গীতে'র মধ্যে 'বল, গোলাপ মোরে বল'—রবীন্দ্রনাথের এই সঙ্গীতদ্বয় ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রশান্ত পালের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, "'সঙ্গীত-কল্পতরু'-র ভূমিকায় 'সঙ্গীত ও বাদ্য' প্রবন্ধে স্বর সাধনা অনুচ্ছেদে তিনি (বিবেকানন্দ) ভৈরব রাগের সরগম দিয়ে ভৈরব কাওয়ালিতে রবীন্দ্রনাথের 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটির প্রথম দু-কলি স্বরলিপি দিয়েছেন। এই গানটিও বর্তমান বৎসরের (ইং ১৮৮৭) মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।"

আজকের বঙ্গ সমাজে রবীন্দ্রনাথের গানের যে অপরিসীম প্রভাব, সমকালে বিবেকানন্দও তাতে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন— তথ্যটি বিস্ময়কর ও অভাবনীয় হলেও একশ' শতাংশ সত্যি। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ স্বামী বিবেকানন্দের 'ব্রহ্মসঙ্গীতে'র প্রতি যে একটা আলাদা টান থাকবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভাবাসৌন্দর্যের নিরিখে রবীন্দ্রনাথের গান স্বামীজির অধিক পছন্দের ছিল বলে মনে করছেন সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সঙ্গীত সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' প্রণেতা দিলীপকুমার

এরপর ৭ পাতায়

৬ পাতার পর

মুখোপাধ্যায়। 'কথামৃতে'র সূত্র উল্লেখ করে যে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে রামকৃষ্ণদেবকে শুনিয়েছিলেন, সে বিষয়ে একটি কালানুক্রমিক তালিকা নিবন্ধ গবেষণাপত্র টীকা-টিপ্পনী সহযোগে পাঠকের সামনে অসাধারণভাবে পরিবেশন করেছেন প্রশান্তকুমার পাল। তাঁর লেখনী:

"(১) ২৫ চৈত্র ১২৮৯ (শনি ৭ এপ্রিল ১৮৮৩) 'গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে'। (৪র্থ ভাগ, ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। উল্লেখযোগ্য যে, গানটি ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল; তাছাড়া সঙ্গীত-কল্পতরু গ্রন্থে নানকের মূল রচনা সহ সংকলিত হয়। ২৭ বৈশাখ ১২৯২ (ইং শনি ৯ মে ১৮৮৫) তারিখে নরেন্দ্রনাথ গানটি পুনরায় পরিবেশন করেন (৩য় ভাগ, ১৩শ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

(২) ৩০ ভাদ্র ১২৯১ (রবি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪) 'দিবানিশি করিয়া যতন' (৪র্থ ভাগ, ১৯ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ); গানটি বর্তমান বৎসরের (১৮৮১) মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

(৩) ২৯ ফাল্গুন, ১২৯১ (বুধ ১১ মার্চ, ১৮৮৫) 'দুখ দূর করিলে দরশন দিয়ে' (১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ); গানটিও বৈশাখ ১২৯৩ তারিখেও গাওয়া হয়েছিল (৪র্থ ভাগ, ৩৩শ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)। উল্লেখযোগ্য যে, কথামৃত গ্রন্থে দু-জায়গাতেই 'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে' পাঠ দেখা যায় এবং এই কারণেই অনেক গবেষক এটিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে চিনতে পারেননি। গানটি ১২৯১ বঙ্গাব্দের মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। ১১ মাঘে গাওয়া গান ২৯ ফাল্গুন নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে উঠে এসেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও আগ্রহের এই দৃষ্টান্তটি অবশ্যই লক্ষ করবার মতো।

(৪) ৩১ আষাঢ় ১২৯২ (১৪ জুলাই ১৮৮৫) 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' (৪র্থ ভাগ, ২৩শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ); গানটি দ্বিতীয়বার গাওয়া হয় ৯ কার্তিক ১২৯২ (শনি ২৪ অক্টোবর, ১৮৮৫) তারিখে (৪র্থ ভাগ, ২৮শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। এটি বর্তমান বৎসরের (১৮৮১) মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল। শ্রীম ২৯ ফাল্গুন ১২৯১ তারিখের বিবরণে (১ম ভাগ, ১৪শ খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ) অন্য প্রসঙ্গে গানটির প্রথম দুটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন। এ থেকে মনে হয়, নরেন্দ্রনাথ এই দিন বা এর আগে কোনদিন এটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন (অবশ্য অন্য সূত্রেও শ্রীম গানটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকতে পারেন)।

(৫) ৯ কার্তিক (শনি ২৪ অক্টোবর ১৮৮৫) 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত' (৪র্থ ভাগ, ২৮ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ)। এটি বর্তমান বৎসরের (১৮৮১) মাঘোৎসবে গীত হয়েছিল।

(৬) ১২ কার্তিক ১২৯২ (মঙ্গল ২৮ অক্টোবর ১৮৮৫) 'একি এ সুন্দর শোভা' (১ম ভাগ, ১৮শ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) গানটি বর্তমান বৎসরের (১৮৮১) মাঘোৎসবে সায়ংকালীন অধিবেশনে গাওয়া হয়েছিল।

(৭) ২৬ বৈশাখ ১২৯৪ (শনি ৭ মে ১৮৮৭) 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন।' (২য় ভাগ, পরিশিষ্ট, ২য় পরিচ্ছেদ)। এই গানটি দিয়েই বর্তমান বৎসরে (১৮৮১) মাঘোৎসবে প্রাতঃকালীন উপাসনা শুরু হয়েছিল। নরেন্দ্রনাথ গানটি গেয়ে ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের প্রায় ন-মাস পরে বরাহনগর মঠে, এর পূর্বেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন।"

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য পরিবেশনের লোভ সামলান গেল না। প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব ১৮৮৭ সালের ৭ মে-র বহু পূর্বেই বি এ পরীক্ষার প্রথম দিন বন্ধু হরিদাস ও দাশরথির বাসায় নরেন্দ্রনাথ এই সপ্তম গানটি ('আমরা যে শিশু অতি') গেয়েছিলেন। তাহলে বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে উপরোক্ত যে সাতটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে পাঁচটিই কিন্তু গাওয়া হয়েছিল ১৮৮১ সালের মাঘোৎসবে। এই সূত্রে বলা চলে—'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ১৮৮১ সালের ফাল্গুন সংখ্যা উদ্ধৃত করে, ওই বছরের মাঘোৎসবে যে বালক-বালিকারা রবীন্দ্ররচিত বিভিন্ন গান গেয়েছিলেন তাদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি থাকা অসম্ভব নয়, প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমিত এই তথ্যটির সারবত্তা যথেষ্টই রয়েছে। রামকৃষ্ণদেবকে শোনানো এই গানগুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত যে বিবেকানন্দ নিয়মিত গাইতেন তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে স্বামী অপূর্বানন্দ সংকলিত 'সাধন সঙ্গীত' গ্রন্থে (তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ চাইলেও বিবেকানন্দ মেশেননি' গ্রন্থে উদ্ধৃত)। তাতে উপরোক্ত কয়েকটি গান ছাড়াও '(তাঁরে) আরতি করে চন্দ্রতপন', 'তুমি বন্ধু, তুমি নাথ', 'সত্য মঙ্গল প্রেমময়'—রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি বিবেক কণ্ঠে গীত হবার কথা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন' গানখানি স্বামীজী যে সযত্নে তাঁর গানের খাতার ৫৭ পৃষ্ঠায় সুর সহ টুকে রেখেছিলেন, এই দুর্লভ সংবাদটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৮৩) প্রমাণ সহ উপস্থাপিত করেছেন স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ।

যৌবনে নরেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রীতির গল্প এখানেই শেষ হচ্ছে না। স্বামীজীর বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের স্মৃতিকথায় পাওয়া যাচ্ছে, বি. এ-পরীক্ষার প্রথম দিনে 'মাথাটিকে সাফ রাখতে' এবং 'মগজটিকে একটু জিরেন দিতে' চোরবাগানে তাঁর অপর দুই বন্ধু হরিদাস ও দাশরথির বাসায় ভোর থেকে এসে বেলা ৯টা অবধি রবীন্দ্রনাথের 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিত', 'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন' ইত্যাদি গান গেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ('স্মৃতির আলোয় স্বামীজী', স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত)। বিবেকানন্দের এহেন রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালবাসার মধ্যে উভয়ের 'মনের মিলে'রও কিছু মহামূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' নামক গবেষণাগ্রন্থে। বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮৫ সালের ৯ মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বিবেকানন্দের গান গেয়ে শোনানো প্রসঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীতও তিনি (বিবেকানন্দ) গান করেন—'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে' (বাহার, একতালা)। এই গানটি রবীন্দ্রনাথ শিশু বয়সে গাইতেন। সে কথা তিনি 'জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন'"।

শুধু সন্ন্যাস-পূর্ব জীবনেই নয়, সন্ন্যাস জীবনেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি বিবেকানন্দের আকর্ষণ যে বিন্দুমাত্র কমেনি তার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু এই ব্যাপারে ক্ষিতিমোহন সেনের স্মৃতিকথার বিশেষ মূল্য রয়েছে, অন্য কারণেও। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার পূর্বে দেখে নেওয়া যাক, 'বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' (শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৫) প্রবন্ধে ক্ষিতিমোহন কী বলছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার ভাগ্য এমন যে, প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পাই কাশীতে। আর যাঁর কণ্ঠে সেই গানটি ধ্বনিত হয়েছিল, তাঁর নাম শুনলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। গানটি কাশীতে গেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। অনেক স্থানে আমি এই কথাটি সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছি। সম্প্রতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তমণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের কয়েকটি অতি প্রিয় গান একখানি বইয়ে মুদ্রিত আকারে পেয়েছি। গানটি এ কী এ সুন্দর শোভা। কী মুখ হেরি এ, ইত্যাদি।" কাশীতে আরও যে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিবেকানন্দের কণ্ঠে শুনেছিলেন বলে ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন সেগুলি হল—'মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে' এবং 'সখী, আমার দুয়ারে কেন আসিল নিশিভোরে যোগী ভিখারী।'

এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ঠিক কোন সালে বিবেকানন্দের কণ্ঠে রবীন্দ্র- রচিত এই গানগুলি শুনেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন। তিনি নিজে কিছু জানাননি কিন্তু বিবেকানন্দের জীবনী পাঠকদের জানা আছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিবেকানন্দ খুব সম্ভবত ১৮৮৭ সাল নাগাদ প্রথম কাশীতে যান। এরপর দ্বিতীয়বার যান ১৮৯০ সালে। তাঁর শৈশব, বেড়ে ওঠা, কৈশোর সবেরই সাক্ষী কাশী। যজ্ঞেশ্বর ভেণীর বাড়িতে তিনি স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি শুনেছিলেন। নিজেই জানাচ্ছেন, 'তখন আমরা ছেলেমানুষ।' অনুমান করা চলে, ১৯০২-এ নয়, ১৮৮৭ কিংবা ১৮৯০ কোনও একটা সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বিবেক-কণ্ঠে শুনে থাকবেন ক্ষিতিমোহন। প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ' (কথাসাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩৭০) প্রবন্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, "১৮৯০ সালে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগের একটি পরোক্ষ উপলক্ষ ঘটে। ওই সালের প্রথম ভাগে নরেন্দ্রনাথের গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের আত্মীয় গগনচন্দ্র রায়ের আশ্রয়ে কিছুকাল বাস করেন। এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পূর্বে (১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে গাজিপুরে এসে গগনবাবুর আশ্রয়ে বাস করে যান। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ যে গগনবাবুর কাছ থেকে সে বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন, তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অর্থাৎ গগনবাবুই ছিলেন উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র।" ১৮৯০ সালে বিবেকানন্দের কাশীধামে পৌঁছানো প্রসঙ্গে তাঁর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দ নিজের 'স্মৃতিকথা' বইতে যে রুট ম্যাপ দিয়েছেন তাতে জানা যাচ্ছে, 'ক্রমে ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ, গাজিপুর, কাশী, অযোধ্যা, নৈনিতাল ও আলমোড়া।' অর্থাৎ ১৮৯০ সালে স্বামীজী গাজিপুর হয়ে কাশী পৌঁছেন। প্রবোধচন্দ্রের উপরোক্ত গবেষণার সূত্র ধরে অনুমান করা যায়, গাজিপুরে রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ যোগসূত্রেই সদ্য সন্ন্যাসীর হৃদয়ে হয়ত বা তাঁরই গানের সুরের অন্তধারা বইয়ে দিয়েছিল। অনুমান বিশ্বাসে পর্যবসিত হয় যখন দেখি, যে সময়ে যজ্ঞেশ্বর ভেণীর বাড়িতে অবাধে প্রবেশ করতেন ক্ষিতিমোহন তখন তাঁর বয়স সাত (অর্থাৎ ১৮৮৭ সাল) না হয়ে দশ (অর্থাৎ ১৮৯০ সাল) হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ সাত বছরের একটি ছেলের পরিবর্তে দশ বছর বয়সী ছেলের রবীন্দ্রসঙ্গীতের বোধগম্যতার পাশাপাশি একা একা বাইরে বেরোনোর অভিভাবক অনুমতির সম্ভাবনা যে খুব বেশি তা সহজবোধ্য কারণেই মনে হয়। তাঁর লেখার ধরণ দেখে মনে হয় তিনি একা একাই যেতেন ভেণীর বাড়িতে।

১৮৯৩ সালে শিকাগোয় স্বামীজীর বক্তৃতা সারা ভারতে আলোড়ন তুলল। তাঁর মনে কবি তখন কীরূপে বিরাজ করছিলেন, তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু বিশ্বকবির মনতটে বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসী তখন স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছেন নিশ্চয়ই। 'রবিজীবনী'কারের অনুমান, আমেরিকায় বিবেকানন্দের বিশ্ববিজয়ের সংবাদ মাথায় রেখেই রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন, "সন্ন্যাসীরা যেরকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত তাহলে আমি অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে-দেশান্তরে ঘুরে আসতাম।...কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ডা. কালিদাস নাগ, "পুণার পণ্ডিতা রমাবাই এক বাঙালিকে বিবাহ করেন, বিধবা হয়ে পরে খৃষ্টান হন; মার্কিন গোঁড়া খৃষ্টান নর-নারীগণ 'রমাবাই সার্কেল' গঠন করে স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছিল, শ্রীমতী বার্ক (অক্লান্ত) সেসব ছেপে দিয়েছেন (দ্রষ্টব্য স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট, নিউ ডিসকভারিজ, দ্বিতীয় খণ্ড, মেরি লুইজ বার্ক)। তার প্রতিধ্বনি পাই সেকালে শ্রীমতী সরলা ঘোষাল (রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী) ও বিবেকানন্দের পত্রালাপে। রবীন্দ্রনাথও (বিবেকানন্দের পক্ষে ও রমাবাইয়ের বিপক্ষে) সেকালের পত্রিকায় লিখেছিলেন।" ('বিবেকানন্দ-জীবনীর উপাদান সংগ্রহ', উদ্বোধন, মাঘ ১৩৬৮)। 'রমাবাই সার্কেল' গঠন করে স্বামীজীকে অপদস্থ করার চেষ্টা হয় তাঁর শিকাগো বক্তৃতা পাশ্চাত্যেও সাড়া ফেলে দেবার অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ১৮৯৪-৯৫ সাল নাগাদ। কিন্তু এনিয়ে সেকালের পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ কী লেখনী ধারণ করেছিলেন, গবেষকরা সে সম্পর্কে কেন যথেষ্ট অনুসন্ধান এখনও অবধি করেননি তা নিশ্চয়ই বিবেচনার দাবি রাখে।

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরলে শোভাবাজার রাজবাড়িতে রাজা বিনয়কৃষ্ণদেবের সভাপতিত্বে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয় ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। সমকালীন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে ওই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিতির তালিকায় ঠাকুরবাড়ির অনেক লোকের নাম চোখে পড়ে। যেমন জানকীনাথ ঘোষাল (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী), ক্ষিতীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও সুধীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায়। সেখানে কোথাও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ নেই। 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রখ্যাত লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'এই সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।' (রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড)। পাদটীকায় এর তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, "এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিতির কথা রবীন্দ্রনাথ শ্রী অমল হোমকে বলিয়াছিলেন।" এই তথ্যটি পরবর্তীকালে বিতর্কের সৃষ্টি করে। কারণ একদিকে এর কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। অন্যদিকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহচরদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই স্পর্শকাতর

এরপর ৮ পাতায়

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
200 Winston Drive#2920
Cliffside Park,
NJ-07010
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
e-mail :
ranusarkar@hotmail.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS#020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive#2920, Cliffside Park, NJ-07010
and
additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

৭ পাতার পর

রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ সম্পর্কের পারদ

বিষয়টির সম্বন্ধে সম্যক অবহিত না হলেই লিখকেন তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থ বলে স্বীকৃত 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এমনটা বিশ্বাস করাও কঠিন। কিন্তু সবদিক সাবধানে বিচার করে মনে হয় ১৮৯৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শোভাবাজার রাজবাড়িতে বিবেকানন্দের সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিত না থাকার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ প্রশান্তকুমার পাল ওই তারিখেই রবীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার একটি চিঠির অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন (রবিজীবনী, চতুর্থ খণ্ড)। যে চিঠিতে মাধুরীলতা রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছেন, 'তুমি কবে কলকাতায় আসিবে?' স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের অবস্থান সেই সময় মফস্বলে। এক্ষ যদি না মাধুরীলতা নিজের অজান্তে সেই চিঠি লিখে থাকেন তবে এই সম্ভাবনাটি খুবই কম বলে মনে হয়।

যৌবনে তাঁদের দু'জনের সঙ্গীতানুরাগের কারণে এবং মার্কিনদেশে সন্ন্যাসী'র জয়যাত্রায় কবির সহর্ষ মনোভাব রবীন্দ্র-বিবেকানন্দের সম্পর্কের পারদকে যেটুকু ঊর্ধ্বমুখী রেখেছিল তা বলাই বাহুল্য। তবে ১৮৯৭ সালে আমেরিকা থেকে স্বামীজী'র প্রত্যাবর্তনের পর উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কে শৈথিল্য দেখা দেয়। পরবর্তীসময়ে এঁদের দু'জনের মধ্যে যোগসূত্র হন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর প্রতি বিবেকানন্দের নির্দেশ ছিল, 'মেক ইনরোডস টু দি ব্রাহ্মস' (ব্রাহ্মদের মধ্যে ঢুকে পড়ো)। নিবেদিতা ১৮৯৮সালে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় আসার পরই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের নতুন করে যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। নিবেদিতার বহু অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী গবেষক শংকরীপ্রসাদ বসু এক দশকের অক্লান্ত পরিশ্রমে আনার পরই রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্কের বহু অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা মাথায় রাখা দরকার। সেই সময় কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের পথ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিয়েছে। যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে একই পথের পথিক হওয়া তখন অতীত। একদিকে রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পর কবিপত্নী মৃণালিনীর কোল আলো করে এসেছে রথীন্দ্রনাথ, মাধুরীলতা, রেণুকা, মীরা ও শমীন্দ্রনাথ। তিনি তখন সৌন্দর্যপ্রিয় কবি হিসেবেই পরিচিত ও খ্যাত। অন্যদিকে বিবেকানন্দ তখন কঠোর কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মার্কিন দেশে সন্ন্যাসের জয়ধ্বজা উড়িয়ে সদ্য দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। নিবেদিতার পত্রাবলীতে দেখা যায় ঠাকুরবাড়ির জীবনরীতি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন বিবেকানন্দ, 'সাধারণভাবে ঠাকুরবাড়ির প্রভাব বাংলাদেশের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে, অন্ততঃ একটি দিক থেকে, একথা অতি তীব্রভাবে বলেছিলেন (বিবেকানন্দ)। ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যসৃষ্টি বাঙালির জীবনে পৌরুষ সৃষ্টির সহায়ক নয়—এই ছিল তাঁর মত। ঠাকুরবাড়ির কোনও একজনের রচিত (অনুমান রবীন্দ্রনাথের) কিছু কবিতা (অনুমান 'কড়ি ও কোমলে'র) পড়ে শোনবার পরে তিনি কঠিনভাবে বলেন, 'এই পরিবার ইন্দ্রিয়রসের বিষ বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দিয়েছে।'' ('বিবেকানন্দের ও সমকালীন ভারতবর্ষ', চতুর্থ খণ্ড, শংকরীপ্রসাদ বসু)।

একথা অনস্বীকার্য যে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে ব্যথিত করেছিল দেশের মানুষের ভীরু-মনোভাব, কাপুরুষতা। সন্ন্যাসীর যৌবনের ভাবনাগুলো কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তখন যেন আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়েছিল। ১৮৯৯ সালের ১২ মার্চ মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার ওই পত্রে বিবেকানন্দের পরবর্তী কথাগুলো খেয়াল করুন, "তিনি (বিবেকানন্দ) জ্বলে উঠে বলেছিলেন—'আমার জীবনোদ্দেশ্য-রামকৃষ্ণ নয়—বেদান্ত নয়-আর কিছু নয়-শুধু জনগণের মধ্যে পৌরুষ আনা'।" (সূত্র ঃ তদেব) ঠাকুরবাড়ি সম্পর্কে স্বামীজী'র এহেন বক্তব্যকে তাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বলে ধরে নিতে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ যে রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনদেবতা, সেই রামকৃষ্ণ তাঁর জীবনোদ্দেশ্য নয় একথা তখনই বলা যায় যখন পরাধীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত নির্বীর্য দেশবাসীর হীনমন্যতা, কাপুরুষোচিত মনোভাব বিপর্যস্ত সন্ন্যাসীর হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।

অনেকের ধারণা, পরিব্রাজক গ্রন্থে কবিকেই ঠাট্টা করেছেন সন্ন্যাসী, "ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম নরম বুলি কাটেন, এঁকে বেঁকে চলেন, কারুর চোখের ওপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন। আর বিরহের জ্বালায় 'হাসেন হোসেন' করেন।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড)। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গবেষক অমিতাভ চৌধুরীর অভিমত, "বিবেকানন্দের এইউক্তি অকারণ নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর সে সময়কার উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা পরে লিখেছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে তিনি বলেছেন, সে সময় কিছুকালের জন্য তাঁর' একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনোভাব ও বাহিরের আচরণ' দেখা দিয়েছিল।" (কবি ও সন্ন্যাসী, শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৮৪)। তবে 'পরিব্রাজক'-এ বিবেকানন্দের এহেন উক্তির লক্ষ্যবস্তু যে রবীন্দ্রনাথই এমন কোনও প্রমাণ নেই। আর যদি হয়েও থাকেন, বিবেকানন্দের অভিযোগ সর্বাংশে সত্যি একথা বলার উপায় নেই। কারণ ১৯০১ সালের শেষের দিকে কবিগুরু শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেন। অমিতাভ চৌধুরীর ভাষায়, ''১৯০১ সালে (রবীন্দ্রনাথ) শান্তিনিকেতনে শুরু করেন নতুন এক কর্মযজ্ঞ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ এবং ভারতীয় প্রথায় শিক্ষা —এই দু'টি কর্তব্য পালনের মূলে ছিল স্বদেশবাসীকে চিন্তায় ও কর্মে বলীয়ান করা, ভিখারির মনোভাব পাল্টে আত্মশক্তির উদ্বোধন করা।" (সূত্র ঃ তদেব)। কবির কর্মের সঙ্গে সন্ন্যাসীর ভাবনা চিন্তার অদ্ভুত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।

তবে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ, দু-পক্ষের এই সম্পর্কের এই ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির মাঝেও এঁদের অনুরাগীদের স্বস্তির কারণ একটাই। যৌবনে লীলাবতী মিত্রের বিবাহবাসরে মুখোমুখি হওয়া ছাড়া এই একবারই এঁদের দু'জনের মুখোমুখি হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এবং প্রামাণ্য অবশ্যই নিবেদিতার পত্রাবলী। তবে লক্ষণীয়, সেই সময়কার এঁদের সম্পর্কের কালো মেঘ নিবেদিতারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৯ সালে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠিতে নিবেদিতা জানান, ''(স্বামীজি) একটা চা পান সভার আয়োজন করতে বললেন, তাতে আমন্ত্রিত হবেন সকল ব্রাহ্ম বন্ধু, সে সভায় তিনি আসবেন এবং কথা বলবেন! আয়োজন করব কিনা অনুমান করতেই পারে। বন্ধুদের আসতে বলব, রায়েদের (অপরা রায়-রা), মি. মুখার্জি, মি. মোহিনী (মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়), মি. টেগোর (রবীন্দ্রনাথ), সরলা ঘোষাল এবং তাঁর মা (স্বর্ণকুমারী দেবী)-কে বোমকেশচন্দ্রী হতে পারছি আমার, রীতিমত উত্তেজনা বোধ করছি, বটেই, কেননা এহেন মহাসিংহের প্রদর্শনী!'' (শংকরীপ্রসাদ বসু কৃত বঙ্গানুবাদ)। প্রস্তাবিত সরকারি চা পান সভা না হলেও 'মহাসিংহের প্রদর্শনী' কিন্তু হয়েছিল ওই বছরের ২৭ জানুয়ারি।

৩০ জানুয়ারি নিবেদিতা এবিষয়ে ম্যাকলাউডকে লেখেন, ''স্বামীজি একেবারে দিব্য ব্যাপার। প্রায় প্রতিদিন একবার তাঁর সঙ্গে আহার করি। গতকাল পার্টিতে এসেছিলেন। শনিবারও (২৭ জানুয়ারি, ১৮৯৯) বন্দোবস্ত ছাড়াই একধরনের পার্টি হয়ে গিয়েছিল। মিসেস পি কে রায় এবং তরুণ মি. মুখার্জি, মি. মোহিনী এবং কবি (রবীন্দ্রনাথ), তারপর অনতিবিলম্বেই সরকারসহ স্বামীজী অতি চমৎকার ক্ষুদ্র এক সমাবেশ। মি. টেগোর (রবীন্দ্রনাথ) তাঁর মনোরম চড়া সুরে স্বরচিত তিনটি গান গাইলেন। স্বামীজীও অনবদ্য।...এই মুহূর্তে (যখন নিবেদিতা চিঠিখানি লিখছেন) আমার চারপাশের বাড়িতে সন্ধ্যার ঘণ্টা ও ঘড়ি বাজছে। এই সময়কেই এখানে বলা হয় গোধূলি—সন্ন্যাসীদের কাল— প্রার্থনার প্রহর। সেই অপূর্ব কবিতাটি, 'এসো শান্তি'—তার মৃদু উদাস সুর—মি. টেগোর যেটি আমাদেরই জন্য রচনা করেছিলেন ও গেয়েছিলেন, এমনি সময়ে, সেই সন্ধ্যাটিতে—ভুলতে পারছিনা কেউই।'' (শংকরীপ্রসাদ বসু কৃত বঙ্গানুবাদ)।

নিবেদিতার এই পত্র থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, সেই ঘরোয়া চা-পান সভায় রবীন্দ্রনাথ গান গেয়েছিলেন, যার অন্যতম শ্রোতা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নিবেদিতা গানটির বর্ণনা করেছেন, 'কাম ও পীস' (এসো শান্তি)। শংকরীপ্রসাদ বসু মনে করছেন গানটি হল—'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। শূন্য ঘাটে একা আমি, পার ক'রে লও খেয়ার নেয়ে।।' তাঁর এহেন অনুমানের কারণ 'এসো শান্তি' শব্দদু'টি দিয়ে কোনও গান শুরু হওয়ার নজির 'গীতবিতান'-এ নেই। একমাত্র পূজা পর্যায়ের এই, 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে' গানটির শেষের দিকে 'এসো শান্তি' শব্দদুটি রয়েছে। রবীন্দ্র-গবেষক প্রশান্তকুমার পালও এই মত সমর্থন করেছেন। সঙ্গে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবে জানাচ্ছেন, নিবেদিতা গানটির প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছেন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই জন্য গানটি রচনা করেছিলেন, এই তথ্যটি ভ্রান্ত। কারণ গানটি ৮আশ্বিন বাংলা ১৩০২ সালে শিলাইদহে বোটে বসে লেখা। নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথের আরও দু'টি গান গাওয়ার কথা আছে। তবে সেই গানগুলির বর্ণনা কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, এই চা-পান সভায় কি বিবেকানন্দও গান গেয়েছিলেন? নিবেদিতার লেখার ধরনে তেমনটা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের 'মনোরম চড়া গলায় গান গাওয়া' প্রসঙ্গে নিবেদিতা চিঠিতে লিখেছেন, 'অ্যান্ড স্বামী ওয়াজ গ্লোরি' (স্বামীজীও অনবদ্য)। স্বামীজী গান গেয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, তবে স্বামীজী যে চমৎকারভাবে কথা বলেছিলেন ওই চা-পানের আসরে, নিবেদিতার ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৯-এর চিঠিতে তার উল্লেখ রয়েছে।

পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত মতপার্থক্য যাই থাকুক না কেন, বাঙালির এই দুই হৃদয়দেবতা যে পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার উৎকৃষ্ট নমুনা মেলে রোমাঁ রোলাঁর ভারতবর্ষের দিনপঞ্জীতে (অনুবাদ অবন্তীকুমার সান্যাল)। এই দিনপঞ্জীর ১৯২৬ সালের ৫ অক্টোবরের বিবরণে জানা যায়, জাপানী শিল্পী কাকুজী ওকাকুরা সুদূরজাপান থেকে এদেশে এসেছিলেন বিবেকানন্দের সন্ধানে (১৯০১)। গঙ্গার পাড়ে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হলেন স্বামীজী তাঁকে বলেছিলেন, 'এখানে আমার সঙ্গেআপনার করণীয় কিছুই নেই। এখানো তো সর্বস্ব ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে যান। তিনি এখনও জীবনের মধ্যে আছেন।' ওকাকুরা গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সন্ধানে। বিশ্বভারতী পত্রিকা (মাঘ-চৈত্র ১৩২১)-র ধরা রয়েছে রোলাঁকে বলা স্বামীজী'র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ মন্তব্য যা বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সর্বোত্তম মূল্যায়নের স্বীকৃতি পেতে পারে অনায়াসেই। গুরুদেব রোলাঁকে বলেন, 'যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও বিবেকানন্দকে জান। তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুই ইতিবাচক। নেতিবাচক কিছু নেই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মদের ও ঠাকুরবাড়ির মনোভাব রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছিল অনিবার্যভাবেই। নিবেদিতার একটি পত্রেই পাওয়া যায়, ''শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে (ব্রাহ্মদের) সমালোচনার কথা শুনে স্বামীজী রীতিমত জ্বলে উঠলেন; বললেন—ওসব কথা শুনে আমার ধৈর্য যে নষ্ট হয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয়নি—তখন দেখবার মতো তাঁর চেহারা !...'' (বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরীপ্রসাদ বসু, চতুর্থ খণ্ড)। পরিস্থিতি আরও জটিল হয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তরফে বিবেকানন্দের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নি সরলাদেবীর অতি বিচিত্র প্রস্তাবে, 'স্বামীজী রামকৃষ্ণ-পূজাকে বিদায় দিলে তাঁরা তাঁর কাজে যোগদান করবেন' ইত্যাদি। কিন্তু আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তাঁর 'মালঞ্চ' উপন্যাসেই তা ফুটে উঠেছে। সে উপন্যাসের নায়িকা নীরজার আরাধ্য দেবতাই হলেন রামকৃষ্ণদেব। ১৯৩৬ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকীর সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা'—এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচনা করেছিলেন। অপূর্ব কাব্যসুষমা মণ্ডিত মাত্র কয়েকটিসূত্রেই সেই কবিতায় রামকৃষ্ণের সাধনার উপলব্ধি ও উত্তরণকে প্রকাশ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন রবিঠাকুর। ১৯৩৭ সালের ১ থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ সেন্টিনারী কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসম্মেলনের পঞ্চম দিনের অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন তিনি এবং রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গেসভাপতির ভাষণে অন্তরের কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দেন।

বিবেকানন্দ চলে যাবার পরও প্রায় চারদশক জীবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও দেখা-সাক্ষাৎ নিয়ে এই সময় নীরব থাকলেও বিবেকানন্দ সম্পর্কে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি কবির বহু জায়গায় জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়-ই সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের আগ্রহে বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথকে অল্প বয়সেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি'তে এর অসাধারণ বর্ণনা রয়েছে। গবেষক শংকরের গবেষণা, 'এই সময়ে (যখন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী ভ্রমণ করছেন) স্বামী বিবেকানন্দ বেঁচে আছেন, তবে কবিপুত্রের হিমালয় অভিযানের সময় তিনি কোথায় তা স্পষ্ট নয়। (রবীন্দ্রনাথ- বিবেকানন্দ কিছু রটনা, কিছু ঘটনা, আমার সময়, ১০ জুলাই ২০১০)। স্বামীজীর দেহাবসানের পর ১২ জুলাই (১৯০২) ভবানীপুরে সাউথ সাবার্বান স্কুলে আয়োজিত শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বক্তৃতার বিস্তারিত বিবরণ সেদিন লিপিবদ্ধ না হলেও ১৯০৮ সালে এক জনসভায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত বাক্যে (দ্রষ্টব্য পূর্ব ও পশ্চিম, প্রবাসী ভাদ্র ১৩১৫) যে সেই শোকসভার সভাপতির ভাষণেরই প্রতিধ্বনি তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-এর সাহিত্যমূল্য সম্পর্কে বলা, ১৯২৮ সালের ৯ এপ্রিল স্বামীনাথ সরকারকে লেখা চিঠির অনুক্রমণিকায় রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী অশোকানন্দকে লেখা চিঠিতে—সবেতেই সন্ন্যাসী প্রসঙ্গে কবির সশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় মিলবে।

তবে এই দুই বিশ্বপথিকের যাত্রাপথের মৌলিক পার্থক্য অস্বীকার করেননি রবীন্দ্রনাথও। রোমা রোলাঁর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বিবেকানন্দের আইডিয়া ছিল জীবনের বাস্তবকে স্বীকার করা। আমাদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা—যেখানে সৎ অসৎ কিছুই নেই, তার ওপরে উঠতে চায়ই। সৎ-অসৎ বা ভাল-মন্দের বাইরে আসতে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্কহীন ধর্মীয় অনেক আচার-অভ্যাস বিবেকানন্দ মেনে নিতে পারতেন। সত্যের প্রতি আমার মনোভাব একটু আলাদা রকমের। যা স্পষ্টত মন্দ, তাকে সত্য বলে মানা যায় না। সূর্যের আলোতে কিন্তু জীবাণু থাকা অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে একটি সুস্থ অসহিষ্ণুতার অভাবে আজ আমাদের ধর্মজীবন প্রগতিশীল বা সমৃদ্ধমান হতে পারছে না। বরং এক ধরনের অনীশ্বরবাদ ভারতের পক্ষে কল্যাণজনক হতে পারে। কারণ আমি জানি যে, আমাদের দেশ এই অনীশ্বরবাদকে কখনই চিরকালের জন্য গ্রহণ করবে না। এই সুস্থ বলিষ্ঠ মতবাদ ধর্মাঙ্গণের অবাঞ্ছিত আবর্জনারাশি উচ্ছেদ করবে এবং মহীরুহরাই অক্ষত থেকে যাবে।' (রোমাঁ অ্যান্ড টেগোর, ডা. আলেক্স আরুনসন, অমিতাভ চৌধুরীকৃত বঙ্গানুবাদ)।

পরিশেষে একটা কথা স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রনাথ - বিবেকানন্দ, এঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের পারদ যেমনই ওঠানামা করুক না কেন, বাঙালির হৃদিমন্দিরের এই দুই দেবমানব তাঁদের দেড়-শতক ব্যবধানের জন্মসার্ধশতবর্ষে যথাযুক্তে ভারতবাসীকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। আর এটাই বোধহয় আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা।

তথ্য সহায়তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার

শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক অর্জিন ঘোষ

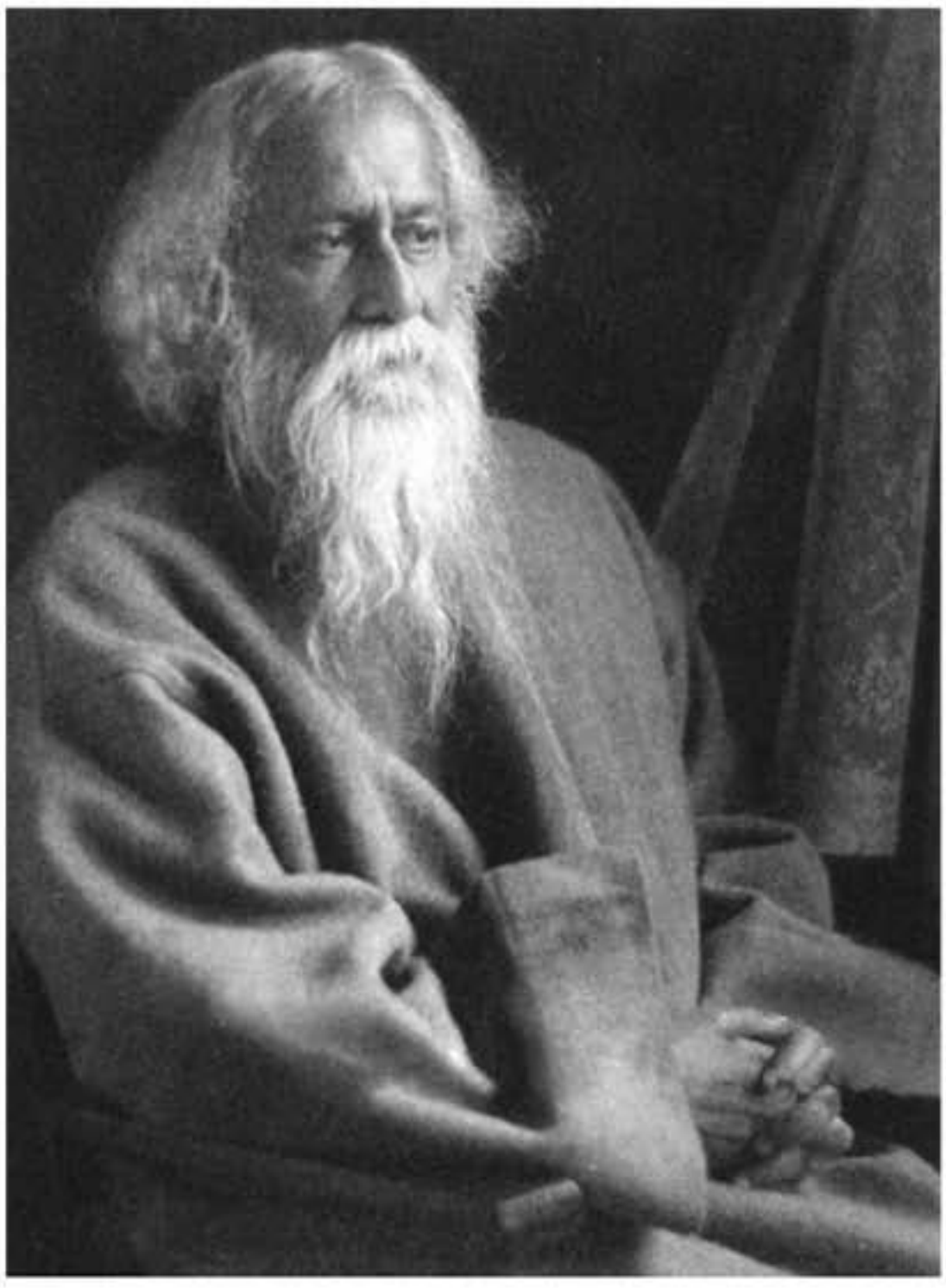

শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে মূল্যবান প্রবন্ধ ও ভাষণ তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে সেইগুলি বিশ্লেষণ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। সর্বাগ্রে আমাদের একটি কথা মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ দেশে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে শিক্ষাপ্রশ্ন গ্রহণ করেছেন ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বহু আগে দেহত্যাগ করেছেন। তাই তিনি পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষার সংকীর্ণ রূপই দেখেছেন এবং সেই শিক্ষার ব্যর্থতা, খণ্ডিতকৃত ভাবনা ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা তাঁকে শুধু ক্ষুব্ধ ও ব্যথিতই করেনি, সেই শিক্ষার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁকে শঙ্কিত করেছে সমধিক ভাবে। আর তাঁকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছে প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার কথা তার শান্ত রসাস্পদ জীবনে গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার কোন বিচ্ছেদ ছিলনা, পুঁথির মধ্যে শিক্ষা আবদ্ধ ছিলনা, মুখস্ত ক্ষমতার ওপর জ্ঞান নির্ভর করত না। শিক্ষা তখন ছিল জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে ওতপ্রোত গন্ডীর মধ্যে জড়িত।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছেন যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হত। কিন্তু জ্ঞানের বিস্তার তো অবশ্য পাঠ্য বইগুলির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, সে কল্পনার জগতেও প্রবেশ করতে চায়, শিক্ষা প্রণালীর বাইরের জগতে ভ্রমণ করতে চায়। ব্রিটিশ আমলে তো ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পাশের পড়া তৈরী করতে হবে তারপর পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে কেরানীবৃত্তি গ্রহণ করতে হবে তাদের ভাগে ব্যাকরণ, অভিধান ও ভূগোলের বিবরণ ছাড়া অবশিষ্ট বেশি কিছু থাকেনা। ফলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মধ্যে আনন্দ থাকেনা, যেটুকু অত্যাবশ্যক তাই শুধু কন্ঠস্থ করে পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া কৃতকার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে যা পড়া হয় তা হজম হয় না, তা মনের ভেতরে প্রবেশ করেনা, কী শিখলাম তা নিভৃতে নীরবে ভাবায় না। শুধু পরীক্ষার খাতায় উগরিয়ে ফেলার জন্যই যে ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করা হয়, বুঝি-না-বুঝি মুখস্ত করে পাশ করাই তখন শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

এটির প্রধান কারণ এই যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইংরেজি তো এক বিজাতীয় ভাষা, ইংলন্ডের ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতিগত যোগাযোগ নেই। তারপর নিচের ক্লাশে যে সব শিক্ষক পড়ান, তারা হয় এনট্রান্স পাশ, না হয় এন্ট্রান্স ফেল। ইংরেজি ভাব-ভাষা আচার-ব্যবহার সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা নেই। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও তারা তেমন পরিচিত নন। তাঁরা যেমন ভালো বাংলা জানেন না, তেমনি ভালো ইংরেজিও জানেন না। তাদের হাতে আমাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়ার অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিয়োগান্ত পরিণতির জন্য অপেক্ষা করা।

আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তি দুইই বাড়াতে হবে। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটাকে আশ্রয় করলে প্রকৃত শিক্ষা লাভ হবেনা, যেমন হবেনা একের প্রতি অত্যধিক ঝোঁকে দেওয়া। কিন্তু আমাদের ছাত্রছাত্রীদের দির্ঘকাল ইংরেজি ভাষার শিক্ষার কাজেই সময় চলে যায় তাদের আর অন্য কিছু শেখার সময় থাকে না। কিন্তু ভিত যদি শক্ত না হয় তাহলে তার উপর নির্মিত সৌধ পদার্থ বিদ্যার নিয়ম অনুসারে শিথিল হবেই। ফলে ছাত্ররা যখন পরে বড়ো হয়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়, তখন তাদের গভীরে ঢুকতে পারে না, অল্প-স্বল্প জ্ঞানের মাধ্যমেই পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে তার ব্যবহার সম্যকভাবে জানা – জীবনের সঙ্গে মিলিত হয়ে তার যথার্থ প্রয়োগ নৈপুণ্যই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা।

আমরা বই পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলে ঠিক করে বসে আছি। কিন্তু এর ফলে আমাদের মন প্রকৃতির শিক্ষাকে অবহেলা করতে শেখে। আমরা ভুলে যাই যে বাল্যকাল থেকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না হলে প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় না বই আমাদের মধ্যে কেবল এক আবরণ সৃষ্টি করে। জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি হারিয়ে ফেলে। বইয়ের বাইরে যে জগত আছে তা যেন আমরা ভুলতে বসেছি। জীবনের সব কিছুর উত্তর আমরা বইয়ের ভেতর খুঁজে বার করার চেষ্টা করি, বই পড়ার ক্রিয়া আমরা সর্বদা আওড়াই, তা ব্যবহার করার জন্য সম্যক ব্যগ্র হই। এই বই মুখস্ত করাকেই আমরা শিক্ষার ক্ষেত্র বলে জানি, আমাদের জ্ঞানের পরিধি বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের মতে জগতকে আমরা মন দিয়ে ছুঁইনা, বই দিয়ে ছুঁই। কিন্তু তাতে আমরা আমাদের স্বাভাবিক শক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলি, ভাববার ক্ষমতা সংকীর্ণ করি। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিই মরে যায়, বইয়ের বাইরে কিছু ভাবতে হবে মনে করে আমরা জুজুবুড়ু হয়ে থাকি। আমরা বিরাট সভায় বইপড়া বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বক্তৃতা করতে পারি, কিন্তু সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারিনা। তারা বই পড়ার মানুষ, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাদের কোন সেতুপ্রাপ্তি নেই।

এখানে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য আমাদের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার মিলন ঘটাতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইংরেজি আমাদের কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয়। সেই ভাবের ভাষা হচ্ছে বাংলা ভাষা, বাঙালির মাতৃভাষা। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত লোকের এক অবজ্ঞার ভাব রয়েছে যেন বাংলা ভাষা আমাদের ভাব প্রকাশের বাহন হতে পারে না। কিন্তু বাংলা ভাষাতেই আমরা প্রকাশ করতে পারি আমাদের জীবনের দুঃখ-বেদনা-ভালবাসা, আমাদের জীবনের ব্যর্থতা ও সম্ভাবনা, আমাদের পরাজয় ও সাফল্যের সৌধচূড়া। আমাদের মনে রাখতে হবে যে বাংলা ভাষার চর্চার মধ্যে দিয়েই সে ভাষার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে। আজ যে পশ্চিমের বিজ্ঞান, দর্শন বা সাহিত্যের ভাব ছাত্ররা প্রকাশ করতে পারছে না, কালক্রমে তাতে তারা সম্যক সুসংগতিশালী হবে। বাংলা বিশ্বের দরবারে অন্যতম প্রধান ভাষা হিসেবে পরিগণিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন যে আমাদের দেশে শিক্ষা একটি ফ্যাক্টরির মতো। সেই ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল দশটার সময় স্কুলে হাজিরা দেয় আর ফেরা হয় বিকেল চারটের সময়। ফলে তৈরী জিনিষের মতো সব একই ছাঁচে ঢালা, সেখানে কল্পনার অবকাশ, হৃদয়ের স্ফূর্তির বা অন্তরের চিত্তবিকাশ একেবারেই অনুপস্থিত। সেখান থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসে তাদের অনেকেই মানসিকভাবে পঙ্গু, জীবন যুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব নিয়ে তৈরী হয় না। এর চাইতে অনেক অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন মুক্ত প্রাঙ্গনে গাছপালার পরিবেশে বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাপ্রদান করা যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃতির কোলে বসেই যেন শিক্ষালাভ করবে। শিক্ষক মহোদয়গণও ফ্যাক্টরির সুপারভাইজার না হয়ে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্ম হবেন, প্রকৃত গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করবেন। প্রকৃত শিক্ষাদানই হবে তাঁদের ব্রত, প্রকৃত শিক্ষালাভই হবে ছাত্রদের পরম কর্তব্য। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগ ছাত্রদের বাল্যকাল থেকেই ধরিয়ে দিতে হবে, কারণ মাটি জল বাতাস ও আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত না হলে প্রকৃত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না।

আসলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ যেন বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রবর্তন করতে চান, যদিও তিনি জানেন যে সেটি এখন সম্ভবপর নয়, এই সেনেট-সিন্ডিকেটের কড়ি-বরগার মধ্যে সেই ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমে সেই প্রাচীন তপোবনের স্বপ্ন নিয়েই ব্রহ্মচর্য আশ্রম স্থাপন করেছিলেন যেখানে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে গাছের ছায়ায় ও পড়ুয়াদের মাটিতে বসে পড়াশুনোর চর্চা হত, যেখানে কোন রূপ দেওয়ালের মধ্যে ছাত্ররা আবদ্ধ থাকত না। যেখানে শিক্ষকরা গুরুর মতোই ব্যবহার করতেন যেখানে তাঁরা সারাক্ষণ জ্ঞানের সাধনাতেই নিমগ্ন থাকতেন। সেখানে ক্লাসের ভেদও বড়ো একটা ছিল না। যে ছাত্র একই বয়েস হওয়া সত্ত্বেও পড়াশুনোয় অগ্রসর, সে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে উপবেশন করত। সেখানে আহারও ছিল নিরামিষ। আবার ছাত্রদের আশ্রমের অনেক কাজে সাহায্য করতে হত। প্রতিদিন ভোরবেলায় যেমন বৈদিক প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে পাঠগ্রহনের পালা শুরু হত, তেমনি সন্ধ্যাবেলায় আবার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সেদিনের শিক্ষা সমাপ্ত হত।

ধর্মশিক্ষা এই পরিবেশে ছিল স্বাভাবিক। সেখানে ধর্মের সঙ্গে শিক্ষার কোন বিরোধ ছিল না। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ধর্মকে যদি আমরা জীবনের এক কোনে সরিয়ে রাখি, যদিও জীবনের অঙ্গনা হয়ে ওঠে, তাহলে ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মের বীজ রপ্ত হবে না, সেটি যৌক্তিক কতকগুলি মুখস্ত বুলির মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে। সমাজে যখন ধর্মের বোধ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যখন ধর্মের জন্য সমাজের লোক সব চাইতে বড়ো ত্যাগ করতে প্রস্তুত, যখন সমাজের ধনীজন এই ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রয়োগের জন্য মন্দির-মসজিদ বা চার্চ স্থাপনের পেছনে অর্থব্যয় করতে কুন্ঠা বোধ করেনা, তখনই এই ধর্মের পরিবেশ সত্যিকারে গড়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে জীবনে ধর্মের স্থানও আছে—সেটি হচ্ছে অনন্তের সন্ধানে যাত্রা, তার আনন্দবোধ, তার রসবোধ গ্রহণ করা। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে যদি আমরা তার সন্ধান না পাই, তাহলে তা হবে আমাদের জীবনেরই দীনতা। আমাদের মনে পড়ে বাইবেলের কথা – 'নট্ বাই ব্রেড অ্যালোন্'। শুধু দিনযাপনের প্রাণধারনের বোঝাই সব নয়, তার মধ্যে দিয়েই মানুষকে অনন্তের সাধনায় ব্যাপৃত হতে হবে, তাঁকে জানার জন্য আকুলভাবে প্রার্থনা করতে হবে। মন তখন বলে ওঠে "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্"—অল্পে সুখ নেই, ভূমার মধ্যেই একমাত্র সুখ। এই ভূমাই সমস্ত মানুষের কাম্য। কিন্তু ব্রহ্মকে তো ধরা যায় না। আমাদের শাস্ত্র বলেছে – "ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন," অর্থাৎ এটি পঠন পাঠনের ব্যাপার নয়, এটি সাধনার ধন। সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই ধর্মবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। কারণ জীবনে ধর্মের স্থান আছে, ছাত্রকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে ধর্মবোধ, নীতিবোধ ও কর্তব্যবোধও তার থাকা চাই এবং ধর্মবোধকে যদি আমরা মানুষের চরম সার্থকতা বলে মানি, তাহলে প্রথম থেকেই বালক বালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপযুক্ত স্থান ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শান্তিনিকেতনে এই রকম আশ্রমই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যেখানে প্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্যের সঙ্গে চিত্তের বিচিত্র সাধনায় মিলিত হয়ে একটি যোগাসন রচিত হবে। সেই হবে প্রকৃত ধর্মশিক্ষার স্থান, জীবনের পরম সুখাসন। যেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্রে হরগৌরির মতো মিলিত হবে, জীবনকে ধন্য করবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসার করতে হবে। কেবলমাত্র পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, স্কুল ঘরের গন্ডির মধ্যে তাকে আবদ্ধ রাখলে চলবে না। জীবনের ক্ষেত্র বড়ো করে দেখতে শিখলে শিক্ষার পরিধিও বিশালতা প্রাপ্ত হবে, চিত্তার মুক্তি লাভ ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ, তাহা হাউইয়ের মতো কোনক্রমে ইস্কুল মাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর

এরপর ১০ পাতায়

শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

৬ পাতার পর

পেশনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে শুষ্ক হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে।' এই মন্ত্রটি জপ করতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটি আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে। আর দেশ পরাধীন বলে হাত-পা গুটিয়ে অকর্মের মধ্যে ডুবে থাকলে চলবে না। একথা সত্য যে আমাদের অজ্ঞ সমাজও আমাদের সবদিক ডুবিয়ে রাখছে, আমাদের মাথা তুলতে দিচ্ছে না। সেই শত বন্ধনের মধ্যেও নিজের শক্তির বলে আমাদের ওপরে উঠতে হবে, আমাদের চেতনার দ্বারে করাঘাত করতে হবে। সর্বত্রই স্বতন্ত্র প্রকৃতি এবং ব্যক্তিপ্রকৃতি নিজের ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করে এবং এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রকেই যথাযোগ্য গ্রহণ ও ব্যবহারই সবচেয়ে বড়ো কথা আর আমাদের মনে রাখতে হবে যে ধর্মের পথেই আমাদের মুক্তি। এই জগৎসংসারের মধ্যে এতো বড়ো আশংকা জগতে আর নেই। এই আশার আলোকে ও আনন্দের সংগীতে আমাদের জীবন গৌরবান্বিত হবে। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরীকৃত হবে। আবার রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি "আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে। এই খানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে—এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।"

একসময়ে আমাদের দেশে টোল, চতুষ্পাঠীতে যে শিক্ষা দেওয়া হত, তা ছিল সমস্ত দেশেই বিস্তৃত। সেখানে বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জনের নিত্যই ছিল ভাব বিনিময়। দেশে তখন এমন স্থান ছিল না যেখানে রামায়ণ-মহাভারতের কথা অগম্য ছিল। তখন সমাজ দেশের বিদ্যা আপনি দেশময় বিতরণ করেছে। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিলনা, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ। তখন ধ্রুব-প্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান বা হরিশচন্দ্রের সর্বস্বত্যাগের কাহিনি সমস্ত দেশজুড়ে কথিত হত। তখন দুঃখ ছিল অনেক অবিচার ছিল প্রভূত, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল প্রতি পদে, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশে এমন এক শিক্ষার প্রবাহ ছিল যা মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠত্বকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারেনা তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার পরিবেশ হল শহুরে। শহরবাসী একদল মানুষ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চাকরি পেল, অর্থ পেল, সম্মান পেল। কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামের আলোও যেন নির্বাপিত হল। শিক্ষার স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গেল, অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা যেন সবলে প্রকাশিত হল। অর্থাৎ আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে আধুনিককালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল, তার প্রবাহ রইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ অবধি হল না।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন না। তিনি জানতেন ব্রিটিশ শক্তির পৃথিবীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের সত্যতা। তাই সেই ভাষা না শিখলে আমরাই পিছিয়ে পড়ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ রুদ্ধ হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানিত স্থান চ্যুত করা বিরুদ্ধ কর্ম হবে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা সে যে কোন দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, তাকে অপরিচিত বলে বাধা দেওয়া মূর্খতার সামিল হবে কারণ চিত্তসম্পদের দানসূত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের সমতুল্য, তাতেই পুষ্টি ও বর্ধন স্বাভাবিক। তাই আমাদের মাতৃভাষার উন্নতির মধ্য দিয়েই বিশ্বের দরবারে আমাদের স্থান করে নিতে হবে। আশার কথা যে বাংলার শিক্ষা জগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ট শাখায় নবপল্লবের সমারোহও এসেছে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে 'শিক্ষা' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত বলেছেন (১) আমাদের শিক্ষাপ্রণালী পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ; (২) ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যবই মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মনে করে; (৩) এই শিক্ষার ফলে কেরানির চাকরির জন্য মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করা হয়; (৪) অতীব ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার ফলে ছাত্রদের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার যোগ হয় না কারণ ছাত্রদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি দুইই বাড়ানো হয়না; (৫) আমরা বই পড়ানোকেই প্রকৃত শিক্ষার আধার বলে মনে করি; (৬) আমাদের শিক্ষার সঙ্গে দেশের সম্পর্ক নিবিড় নয়; (৭) আমাদের প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শ স্মরণ করা উচিৎ; (৮) আজকের আধুনিক সমাজে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মের যেন এক বিরোধ দেখা দিয়েছে, কিন্তু জীবনে ধর্মেরও স্থান আছে তাই অল্পবয়স থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের তাতে জাগিয়ে তুলতে হবে; (৯) বাংলা ভাষাই প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষার বাহন হবে; এবং (১০) সাহিত্য ও সংস্কৃতি হচ্ছে শিক্ষা প্রসারের অন্যতম প্রধান পথ।

যদিও রবীন্দ্রনাথের সময় এখন থেকে অনেক দূরে ছিল, তবুও শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর তিনি যে সব সমালোচনা করেছেন, তা অনেকাংশে তখন যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য আছে। এখনও আমরা পুঁথিগত বিদ্যার ওপর মূলত জোর দিয়ে থাকি, মুখস্থ করে কোনরকমে পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করা সেই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বলে গণ্য করি। পুঁথির গণ্ডির বাইরে আমরা যেতে চাই না। আমাদের শিক্ষা প্রণালীও সেই পথে আমাদের পরিচালিত করে যেখানে কল্পনার বিশেষ কোন স্থান নেই। কিন্তু পশ্চিম দেশের শিক্ষা প্রণালীতে কল্পনার স্থান বড়ো। সেখানে উঁচু ক্লাস হলেই ছাত্র-ছাত্রীদের 'টার্ম পেপার' লিখতে হবে যেখানে একটি বিষয়ের ওপর নিজস্ব গবেষণার ভিত্তিতে প্রবন্ধ লিখতে হবে। তার ওপর পরীক্ষার 'গ্রেড' বা 'স্কোর' নির্ভর করবে। অনেক কোর্সে সাধারণভাবে পরীক্ষাই হয়না, এই 'টার্ম পেপার' ক্লাসে উপস্থাপন ও সেই গবেষণার উৎকর্ষতার ওপর 'গ্রেড'-এর বিচার হয়। যে জিনিষ রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে আমেরিকায় এসে বিশেষ করে দেখেছেন, শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠার পর সেখানে এই ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণা পত্রের ওপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার উল্লেখ করেছেন মুখস্থ বিদ্যার কুফলের কথা যা আজও আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর এক গোড়ায় গলদ হিসেবে অবস্থান করছে।

আজ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঁয়ষট্টি বছর পরে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে। এখন সেখানে বাংলাভাষার মাধ্যমেই পঠন-পাঠন হয়—প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা অবধি। বাংলা ভাষায় এখন বিজ্ঞানের বই ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়, যেমন হয় অনেক বিজ্ঞানের বইও। প্রাথমিক শিক্ষাও অনেক প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু এখনও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কোন প্রবর্তন হয়নি। এখনও শহরে গ্রামে নিরক্ষরতার সংখ্যা অনেক, বিশেষ করে গরীব সম্প্রদায়ের মধ্যে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক স্থাপিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের অনেকেই শিক্ষার মান উন্নত হবার দাবী রাখে। দেশে প্রযুক্তি বিদ্যা অনেক এগিয়ে গেছে, বিশেষ করে নানা 'IIT' কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে। ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাতেও পশ্চিমী দেশগুলির তুলনায় ভারত পিছিয়ে নেই, যেকথা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও হবে সমান প্রযোজ্য। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির এক প্রধান উৎস হচ্ছে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা এদের মধ্যে এখন অনেকেই ব্যবসার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে পশ্চাৎপদ নয়, অনেকেই 'Entrepreneur' হিসেবে বাণিজ্যের জগতে স্থান করে নিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ভারতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষার নিন্দা করেছেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ইংরেজি আজ এক প্রধান আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষা আমরা চিন, জাপান ও অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভাল করে জানি বলেই ভারত আজ 'আউট সোর্সিং' চাকরির এক প্রধান ঘাঁটি। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা 'সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ এতো ভাল করছে তার প্রধান কারণ অনেক দেশের তুলনায় ইংরেজি আমরা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিখতে শুরু করেছি। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু অনেক হৈ-চৈ হবার পর নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে আবার তারা প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা ফিরিয়ে এনেছিল। ইংরেজিকে আজ আর পরদেশী ভাষা বলে অবজ্ঞার ভাব দেখিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া চলবে না। বরং এই ভাষায় আমরা যতই ব্যুৎপত্তিলাভ করতে সক্ষম হবো, ততোই বহির্বিশ্বে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের চাকরির চাহিদা বাড়বে। ততই হবে দেশের সার্বিক মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষাকে অতীতের এক মনপড়ানির দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রশংসা করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতনে যখন প্রথম ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করেছিলেন তখন তপোবনের আদর্শ নিয়েই খানিকটা শুরু করেছিলেন। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে বড়োই নিষ্ঠুর, যে আমাদের কল্পনার জগৎ থেকে টেনে এনে বর্তমান জগতের সামনে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম যখন আস্তে আস্তে 'বিশ্বভারতীতে' পরিণত হল, তখন বাধাধরা শিক্ষা প্রণালী ঠিকই অনুসরণ করতে হল, গাছের তলায় ক্লাস হবার বদলে ঠিকই চার দেওয়ালের মধ্যে তার পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হল। মাস্টার মশায়দের বেতন, ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি সব সমস্যাই অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করেছে, তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একমাত্র স্বাধীন ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যেই বিশ্বভারতী আর্থিক চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে।

তবু 'আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।' এখানে শিক্ষার যে পরিবেশ, সংস্কৃতির যে আবহাওয়া বয়, তা আর কোথাও দেখা যায় না। আজও সে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়নি। এখানে আজও বিদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসে, বিদেশ থেকে অধ্যাপকরা পড়াতে আসে। রবীন্দ্রনাথের তপোবনের স্বপ্ন হয়তো সফল হয়নি, কিন্তু যে বিশ্বভারতী তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেটি এখনও অনন্য, এখনও যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম'—যেখানে বিশ্ব এক হয়ে মিলিত হয়েছে। সেখানেই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার সার্থকতা—তাঁর স্বপ্নের ফসল, তাঁর পরিশ্রমের পরিণতি, তাঁর হৃদয়ের আনন্দধাম।

আমি সাচ্চা হিন্দু: মমতা

প্রথম পাতার পর

ওড়িশায় যে দিন আমরা সরকার গড়ব, সে দিনই আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।" পাল্টা আক্রমণ করে ওড়িশার মাটিতে দাঁড়িয়েই মমতা বললেন, "ওরা পুজোর দিকে তাকালে আমি দিল্লির গদির দিকে তাকাব।

রামনবমীর আগে থেকে পশ্চিমবঙ্গ অস্ত্র হাতে বিজেপি-র আস্ফালনে তৃণমূলের অন্দরেই উদ্বেগ বেড়েছে। তাই মমতার জগন্নাথ বন্দনাকে নিছক পুজোর্চনা হিসেবে দেখতে রাজি নন কেউই। বিজেপি-র উগ্র হিন্দুত্বের মোকাবিলায় তিনি নরম, উদার বা 'ভাল হিন্দু'দের নিজের দিকে টানতে চাইছেন।

এখন প্রশ্ন হল, হিন্দুত্বের হাতিয়ারে বিজেপি-কে পাল্টা বিঁধতে গিয়ে মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে কি প্রভাব পড়বে না? তৃণমূল সূত্রে বলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহদের জমানায় সঙ্ঘ পরিবার যে পথে এগোচ্ছে, তাতে সংখ্যালঘুরা এমনিই সন্ত্রস্ত। এই রাজ্যের শাসক হিসাবে মমতার উপরেই সংখ্যালঘুরা যে আস্থা রাখবেন, এই ব্যাপারে তৃণমূল নেতৃত্বের বিশেষ সংশয় নেই। তাঁরা এখন বিজেপি-র তাস ছিনিয়ে তাদের জমিতে ভাগ বসাতে চাইছেন।

জগন্নাথ মন্দিরে মমতার পুজো দেওয়া নিয়ে এক সেবাইত আপত্তি তুলেছিলেন। পুরীর রাস্তায় রাস্তায় চক খড়িতে লেখা 'গো ব্যাক মমতা' চোখে পড়েছে এ দিন। মন্দিরে মমতার ঢোকার সময়ে 'গো ব্যাক' বলে বিক্ষোভও দেখান দু'জন। পুলিশি ঘেরাটোপে সবুজ পাড় কটকি শাড়িতে মন্দিরে ঢুকে পুরোহিত বিজয়কৃষ্ণ সিংহারির হাত দিয়ে পুজো দেন মমতা। বেরনোর মুখে আবার বিজেপি-র পতাকার সঙ্গে কালো পতাকা নিয়ে এক দল 'ভারত মাতা কি জয়' বলে হাজির হল গাড়ির সামনে। মুখ্যমন্ত্রী মন্দির ছেড়ে বেরনো মাত্রই ধুলোর ঝড় তুলে মুষলধারে বৃষ্টি অবশ্য জল ঢেলে দিয়ে বিক্ষোভে।

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা ২০/০৪/২০১৭

কাঠগড়ায় এক ডজন নেতা-মন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

করা যেতে পারে যে শঙ্কুদেব কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অংশ। সেই কারণেই তাঁর নাম বাদ রাখা হয়েছে।

সিবিআই সূত্রে এ দিন দাবি করা হয়, আগের তদন্ত এখনও অনেকটাই বাকি। অভিযুক্তদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চান সংস্থার গোয়েন্দারা। তাঁদের অফিসকর্মী, দেহরক্ষী এবং ঘনিষ্ঠদের জেরা করারও প্রয়োজন রয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে বলা হচ্ছে। তাঁদের কাছ থেকে আরও তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার আশা করছে সিবিআই।

এখন প্রশ্ন, ১৩ অভিযুক্তের জেলযাত্রা কি অবশ্যম্ভাবী? আইনজীবী মহল জানাচ্ছে, অভিযুক্তরা সংশ্লিষ্ট জেলা আদালত বা সরাসরি হাইকোর্টে গিয়ে আগাম জামিনের আবেদন করতে পারবেন। সেই আবেদন যদি মঞ্জুর হয় তবেই বাঁচোয়া। এক আইনজীবীর ব্যাখ্যা, অভিযুক্ত আগাম জামিন পাবেন কি না, তা মামলার গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে।

২০১৪-এর মার্চে কলকাতা এসে অভিযুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করেন নারদ নিউজের কর্ণধার ম্যাথু স্যামুয়েল। এ রাজ্যে ব্যবসা করার অছিলায় তাঁদের সঙ্গে আলাপ জমান এবং টাকা দেন। সেই দৃশ্য তুলে রাখেন গোপন ক্যামেরায়। তাঁর সেই ভিডিও প্রকাশিত হয় ২০১৬-এর ১৪ মার্চ। জনস্বার্থে মামলা হয় হাইকোর্টে। ভিডিও ফুটেজ পাঠানো হয় ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য। প্রাথমিক তদন্তের জন্য এ বছর ১৭ মার্চ সিবিআই-কে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করতে বলা হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে।

তবে, প্রাথমিক তদন্তের সময় বাড়িয়ে এক মাস করে দেয়। সিবিআই অবশ্য হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশের দিন থেকেই এক মাস সময়সীমা হিসেব করেছে। সেই মোতাবেক তদন্তের মেয়াদ শেষ হয়েছে ১৬ এপ্রিল।

নারদকর্তা ম্যাথু এ দিন বলেন, "সিবিআই-এর এফআইআর-কে স্বাগত জানাচ্ছি। এক জন সাংবাদিক হিসেবে স্টিং অপারেশন করেছিলাম। রাজ্য সরকার কলকাতা পুলিশকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে নানা ভাবে আমায় হয়রান করে চলেছে।"

সৌজন্যে – আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৪/০৪/১৭

FURNISHED PAYING GUEST ACCOMMODATION IN SOUTH KOLKATA

Furnished room for rent available in South Kolkata near transportations and shopping complex. Very convenient location.

Phone # 718 591 9164. Cell 9175447900 email y2kdutta@gmail.com

MATRIMONIAL **(পাত্র চাই)**

Hindu Bengali Parents are looking for Hindu Bengali/Non-Bengali boy FOR Canadian 27 years 5ft 2 inch fair family oriented engineer girl. Contact +1 647 993 9453 and/or partner.can@gmail.com

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: _____
Spouse's Name: _____
Address: _____
City: _____ State: ____ ZIP _____
Phone #: _____ E-mail: _____

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : _____ Date: _____

Membership Fee:

[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: ☐
RENEWAL: ☐

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

We are consolidators for Singapore, Qatar, China, Air Canada, PAL, Jet Airways, Air India, Singapore, Korean, Royal Jordanian, Asiana. Our New partner Gulf Airlines Preferred rates on Emirates, Northwest, Lufthansa. Come see our new office 12375 Bissonnet St Suite # B Houston, TX 77099-1273 ; Tel: 888-811-5377; 281- 530-3000 Fax: 281-530-3798 ; Email: camdentravel@aol.com

The Largest Indian Exhibition in America

GLORIOUS INDIA

27-28 MAY, 2017

NJ EXPO CENTER, NEW JERSEY, USA

Exhibition of over 10,000 Indian Products

Cultural Extravaganza featuring vibrant colors of India

Glorious India Talent Contest
Miss India USA
Mrs. India USA
Mr. India USA

Glorious India Awards to Rich & Famous NRIs of USA

Participate in Glorious India as:

- **VISITOR** to explore and buy among thousands of Indian products at the Exhibition
- **B2B DELEGATE** to strike long-term business association with Indian exhibitor companies
- **INVESTOR** to explore lucrative investment opportunities in the growing Indian market
- **SPECIAL INVITEE** to enjoy an exciting array of cultural and entertainment programmes
- **GLORIOUS INDIA TALENT CONTESTANT** to win exciting prizes and precious recognition
- **EXHIBITOR** to promote business or services amongst NRI community

SUPPORTED BY

AIRLINE PARTNER

MEDIA PARTNER

USA-BASED SUPPORTING ORGANIZATIONS

INDIA-BASED SUPPORTING ORGANIZATIONS

www.gloriousindiaexpo.com

Dr. Jayesh Patel | +1 678 778 0109 | drjayesh@praveg.com
Samir Raval | +1 516 642 1887 | samir@praveg.com

PRESS RELEASE FOR PUBLICITY

Conversion of PIO cards into OCI cards

Consulate General of India , New York issued a Press Release :

PIO card holders under the jurisdiction of New York Consulate are requested to urgently convert their PIO cards into OCI cards before the expiry of the deadline for the conversion process which is June 30, 2017.

বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সভা
শনিবার, এপ্রিল ২৯, ২০১৭

NABC 2017

"Experience a Convergence of Music and Culture like Never Before"

Classical * Folk * Adhunik * Rabindra Sandhya

Vishal Shekhar

Neeti Mohan

Sunday Night Concert

Theatre

Rhythm'n'Soul

July 7-9, 2017 Santa Clara Convention Center

info@nabc2017.com | 1-800-NET-NABC | www.nabc2017.com

আমেরিকায় বসন্তকাল ও রবীন্দ্রনাথ

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, অস্টিন-টেকশাস্

আমেরিকায় বসন্তকাল মানে হচ্ছে তিনটি শব্দের সমাবেশ—পুরুষ, নারী ও প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথের কাছেও ভালোবাসার মানে প্রায় একই—আমি, তুমি আর গান। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যেই ধরা পড়েছে বসন্তকালের প্রকৃতি। গান আর কবিতা মানুষের জীবনে যে কত বড় জিনিস এবং কি তার বিপুল ব্যাপ্তি সেকথা যারা জানলো না, তাদের জন্য দুঃখ হয়। বসন্তকালকে যারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে তাদের কাছে বিপুলতর হচ্ছে এর গভীরতা।

বসন্তেরস্পর্শমাধুরী অনুভবের সাথে রবীন্দ্রনাথের বসন্তকালের জন্য রচিত কবিতাগুলি যেন একান্তভাবেই জড়িয়ে আছে। জীবনের নীল নদীটির নিবিড় পাড়ে ঘুম ভাঙা রোদ যখন হাঁটে ঠিক তখনই হাজার স্পর্শের অনুভূতিগুলো অস্ফুটস্বরেকথা কইতে কইতে নড়ে চড়ে।

গরম দেশের লোক বলে সূর্যের আলোকে আমরা তেমন দাম দিই না। সূর্য যেন বাঙালীদের বিনামূল্যের বীমা কোম্পানী। ছয় ঋতু ভরিয়ে আলো জেলেই যাচ্ছে। উল্টো দিকে আমেরিকায় শীত-গ্রীষ্ম দুই-ই চরম ঋতুর দোলায় পাক খায় বলে সূর্য-কিরণকে তারিফ করতে জানে। উত্তর আমেরিকায় রাক্ষুসে শীতে তুষারময়ী বনে বিবশা হয়ে গুটিয়ে থাকেন। স্বপ্নিতযাত্রা বিয়ের বরের মতো নিষ্পত্র গাছগুলো বরফের টোপর পরে নিষ্কর্মা হয়ে বাতাসে দোল খায়। কিন্তু হিমানীর জানালা গলে যেই বসন্তের সূর্যকিরণ গালে চুমো দেয় অমনি তুষারময়ীর শ্বেত কপোল অশোক রাঙা লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে। মনের গড়িমা ফেলে সাজো সাজো রব পড়ে যায়চতুর্দিকে। বসন্তের উত্তরীয়তে তখন কিছু মেঘ, কিছু রৌদ্র সঙ্গে মৃদু-শীতের স্বল্প গরম। রবি ঠাকুরের কবিতায় সেই বসন্তের সূচনা হয় এইভাবে—

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে
তব অবগুণ্ঠিত, কুণ্ঠিত জীবনে
করোনা বিড়ম্বিত তারে...
আজি খুলিও আপন পর ভুলিও
আজি খুলিও হৃদয় দ্বার খুলিও...।

উপমহাদেশে বছর ভাগ হয় ছয় ঋতুতে আর উত্তরআমেরিকায় মাত্র চারটিতে। তাদের আবাস তিন মাসের। আমেরিকায় ঋতুদের জন্ম হয় আকাশে আর মাটিতে। ঋতুরা তাদের নিজস্ব রূপ-রসের খেলা দেখায় প্রকৃতির কোলে। কিন্তু সেই রূপ-রঙের আমেশ নিয়ন্ত্রণ করে অপমান্ন যা প্রকৃতপক্ষে মহাকাশেরই দান।

ক্যালেন্ডারের হিসেব মতো বসন্ত আমেরিকায় আসে মোটামুটি ২০শে মার্চ। সন্ধিকালটিকে বলে ভারনাল-ইকুইনক্স। অর্থাৎ ঐ দিন বিষুব অঞ্চলে সূর্যের আলো পড়ে সরাসরিলম্ব ভাবে হয়ে। যথাক্রমে দিন আর রাতের মাপ হয়ে যায় এক। তারপর উত্তর গোলার্ধে রাত ছোট হতে শুরু করে, আর দিন হয়ে যায় বড়। দিনের পরিধি বেড়ে বেড়ে চলে ২০শে জুন পর্যন্ত। যে তারিখটিকে বলা হয় গ্রীষ্মের অয়নবৃত্তি বা সামার সোলস্টিস্।

ভোর হল বিভাবরী
পথ হলো অবসান
শুন শুন লোকে লোকে ওঠে আলোকেরি জয়গান... ।।

শীতের আমেরিকাকে যদি বলি নরকের ইংগিত তাহলে আমেরিকায় বসন্তের সূচনা হচ্ছে স্বর্গের আহ্বান। বসন্তের আকাশ হয়ে ওঠে উজ্জ্বল নীল। মাটি ক্রমশঃ ফিরে পায় শ্যামলিমা। যে বনস্পতি গুল্মের ছিল নিষ্পত্র তাদের শাখা প্রশাখার গিঁটে গিঁটে উঁকি দেয় এক অস্ফুট প্রাণোচ্ছাস। মনে হয় কুঁড়িদের বিস্ফোরণে পাঁজর ফাটিয়ে হাসবার জন্য তারা তৈরী। আগামী পত্রদের মধ্যে যেন প্রকৃতিরাণী সংগ্রহ করছিলেন প্রাণ, ফুলের মধ্যে রং আর পাখীর গলাতে

গান। এখন দিনের বেলায় মোলায়েম আলো। রাত্রি সামান্য হিমাক্রান্ত হলেও চাঁদের জোছনায় প্রেমের হাতছানি। এখানে রবি-কবি কবিতায় বলছেন—

তুমি কিছু দিয়ে যাও প্রাণে
ফুলের গন্ধে গোপনে
বাঁশির গানে
মর্মর মুখরিত পবনে... ।।

ড্যাফোডিল আর টিউলিপের পাতাগুলো বসন্তে মুখ লুকানো করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। লিলি আর আইরিশের সবুজ ডাঁটিগুলো সূর্যের আলোর দিকে লালুক দৃষ্টিতে তাকায়। লতানো বেসিল তৈরী হয় তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে নীল ফুট বেরিতে। শীতেরদাপটে যে সব কাঠবিড়ালী আর খরগোশেরা লুকিয়েছিল বেরিয়ে বেরিয়ে তারা এখন খোলা জমিতে ঘুরছে লনগুলির আঙ্গিনায়। ব্যাপটে কাঠবিড়ালীর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'চারপাশে পুঁতির মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকায়। তারপর লেজে ভর করে দাঁড়িয়ে উঠে ফস্ করে একবার তান চুলকিয়ে দৌড় দেয় অন্যদিকে।'

রেড উইং এর রঙীন-পাখিরা শীতে কোথায় লুকিয়েছিল কে জানে? ন্যাড়া ডালাপালাতে এখন কিন্তু ওদের লাফালাফি আঁকিয়ে দেখার মতো। দক্ষিণ দেশের পাখীদেরও ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। ওদের স্বাগত জানাতেই বুঝি হলুদ ফরসিথিয়া আর বিচিত্র বর্ণের এ্যাজিলিয়ার রঙিন কুঁড়িগুলো হাসি হাসি মুখ করে ফুটবার জন্য প্রস্তুত।

মাটিরঘাসপাতাগে হাজারহাজার প্রাণ যেন ভূমিষ্ঠ হয়েই প্রকৃতি মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। নব অঙ্কুরের জয়পতাকা দেখি দিকে দিকে। অন্তরীক্ষে লাগে অন্যার্থ শিহরণ। আমেরিকায় বসন্ত ঋতু এলো বুঝি এলো রে। ঠিক যেরকম রবীন্দ্রনাথের গানে ফুটে উঠেছে—তার রূপ—

এতি নিবিড় বেদনা কমানে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে
দূরে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে... ।।

হেলানো পৃথিবীতে উত্তরাভিমুখী সূর্যরশ্মিতেই থাকে অধিকতর উত্তাপ। তখন মোলায়েম আলোর বদলে পাই রুদ্রতেজ। কথ্যভাষায় এই রুদ্রশব্দটির অপভ্রংশই হলো 'রোদ'। তাপমাত্রার বিবিধ রকম ফেরেই মাটিতে আমরা দেখি প্রকৃতির বিচিত্র লীলাখেলা। ধন্য আমরা। মহাকাশের অঙ্গনে যা ঘটছে তার আশীর্বাদরূপেই পাচ্ছিআমরা বসন্তের এত রূপ, রসগানও। রবি ঠাকুরের গানে আছে সেই বসন্তেরই আমেজ—

অনেক দিনের শূন্যতা মোর ভরতে হবে
মৌন বীণায় তন্ত্র আমার জাগাও সুধারবে... ।।

সরকারী প্রতিভূ হল বাবাজীকে ফেব্রুয়ারী মাসের দু-তারিখে গর্তের বাইরে আনা হয়েছিল। আকাশ মেঘলা থাকায় হল বাবু নিজের ছায়া নিজে দেখতে পাননি। আমেরিকার লোকগাথা মতে শীতের তাণ্ডব-নৃত্য এ-বছর তাড়াতাড়িই থামবে। হগবাবু তেনার ছায়া দেখতে পেলে কতকাল নাকি আরো ছয় সপ্তাহ পরেআসতো। অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। তখন ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত। রবি কবির গানে এই কথাটিই বেজে উঠেছে—

একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি
তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনি... ।।

এপ্রিলকে যদি বলি বসন্তের কিশোরকাল তাহলে ওরা যৌবনের বসন্ত আসে মে মাসে। উত্তর আমেরিকায় একটি প্রবাদ আছে 'April-Shower Bring-May Flowers' অর্থাৎ এপ্রিলে যদি বৃষ্টি পড়ে / মে মাসে ফুল ফোটে থরে থরে।

আমেরিকায় খ্রীশ্চিয়ানদের ইস্টার, ইহুদীদের পাস্ওভার এবং তারই পাশে উপমহাদেশের হোলি/নববর্ষ সবই হয় মার্চ-এপ্রিলে। সবকটি উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হলো নবজীবনকে আহ্বান জানানো।

ভরা বসন্তের আগেই টিউলিপ-আইরিশেরা তাদের ফুল-ফোটানোর ব্যাপারে প্রায় শেষ করে ফেলে। ডগউড গাছের সাদাটে লাল বেগুনী ফুলেরা আর এ্যাজিলিয়ারা টিকে থাকে আরও কিছুদিন। ইতিমধ্যে মে মাস এসে পড়েছে। মিডওয়েস্টের চারপাশ জুড়ে টর্নেডোর বিভীষিকা খুলে ধরেছে তার বিধ্বংসী কালো দাঁত। তবুও সে ভয়েকম্পিত নয় মাটির হৃদয়। সারা আমেরিকা জুড়ে এখন যে হাজার ফুলের বাজার বসে গেছে। মরশুমী ফুলেরা তো ছিলই তাদের পাশাপাশি বর্ষজীবি গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, আর রডোডেনড্রনরাও কুঁড়ি ধরাবার জন্য তৈরী হচ্ছে আপনমনে রোদ পড়ে ঝকঝক্ করছে ফুল এবং পাতায় সুসজ্জিত অর্কিড তার ব্যাকটাঙ্গুলো। টর্নেডোর মৃত্যু তাণ্ডব-নৃত্যের বিপরীতে হাজার ফুলের এই উচ্ছ্বাস আশ্চর্য্য নয় কি?

এনেছি বসন্তের অঞ্জলি গন্ধের
পলাশের কুমকুম চাঁদনির চন্দন...
পারুলের হিল্লোল, শিরীষের হিন্দোল, মঞ্জুলবনীর বঙ্কিম কঙ্কন... ।

না! আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের পারুল, চাঁপা, পলাশ, শিরীষ কিছুই নেই। কিন্তু পরিবর্তে যে মরশুমী ফুলেরা আছে তাদের কিছু একটা বিস্তারিত না বললে অন্যায় হবে! পিটুনিয়া, ফ্লক্স, ডেইজী, নিয়ে প্রাকৃতিক বাগান শুরু করা যেতে পারে। কিংবা সাদা ফুটকিতে ক্রীমশন রঙের সুইট উইলিয়ামস বা সাদা-লাল মেশানো ডায়ান্থাস দিয়ে। যারা জাঙ্গিল ধরে ফুলের শোভা ভালোবাসেন তাদের অনেক রংকোর-এর পিটুনিয়া অথবা ক্রীপিং-ফ্লক্স দিয়ে আগেই বর্ডারটা করে নেন। তারপর ক্যান্ডী লাল-সাদা কারনেশনকে সামনে রেখে পিছনে সাদা-হলুদ ডেইজীর ঝাড় লাগান। এর মাঝখানে রাখেন গাঢ় বেগুনী রঙের ভায়োলেট কিংবা নীলচে ফুলের লতানো মার্টিলের দঙ্গলকে। এই রং মেলানো বর্ডারের সাজটা লাগে যেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'থানিকটা সাঁওতালী মেয়েদের গলায় ঝোলানো পুঁতির মালার মতো।'

ভরা বসন্তের রোদের তাপ যেমন বেড়ে চলে তেমনি বাড়ে হালকা প্যাস্টেল রঙের বদলে গাঢ় রঙের ফুল। বাগানে ফুটে ওঠে গাঢ় লাল-হলুদের ছোট ছোট গ্রীষ্ম-রোজ, টকটকে লাল-বেগুনী আর হলুদ মিশ্রিত বিভিন্ন ধরনের হায়াসিন্থ। ওদের ফুল থেকে তীব্র গন্ধ বের হয়। সেই গন্ধ কারুর ভালো লাগে, কেউ আবার সহ্য করতেই পারেন না। হায়াসিন্থের চেহারাগুলোও হয় বিচিত্র রকমের। কাউকে দেখতে থোকা থোকা ফুল সাজানো আনারসের মতো। কাউকেলাগে খাম্বামোনের চোঙার মতোই। কোনো কোনোটা শুধু একহারা চেহারা নিয়েই খুশি। এই সময়ই পাতলা ঝিনঝিনে ঝুমকাভিলার ফুল ফোটে। উপমহাদেশে আমরা যাকে বলতাম কাগজের ফুল। গাঢ় কমলা হলুদে মেশানো ন্যাস্টারশিয়ামের ফুলগুলো সবুজ লতাপাতার মধ্য থেকে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করে এই সময়েই। ডালিয়া, জিনিয়া কিংবা গ্লাডিওলারা না ফুটলেও তাদের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয় এই ভরা বসন্তে। যেমন আরও হয় বেগুনি কিংবা সাদাটে ম্যাগ্নোলিয়ার ধীরে ধীরে পুষ্পিত হওয়া। যেমন করে জুঁই ফুলের মতো দেখতে হানিসাকলের সাদা কিংবা হলদেটে ফুলগুলি বেড়ে।

বনে বনে জাগো মুকুল
বহে মনে মনে দখিন হাওয়া... ।

বসন্তে আরও কত যে ফুল ফোটে তার ইয়ত্তা নেই। এর মধ্যে হলুদ জিনিয়া, নীলচে

এরপর ১৬ পাতায়

নোবেলের সেই দিন

(সংগৃহিত)

পুরস্কারের চিঠি হাতে পেয়ে রবিঠাকুর মেতেছিলেন আশ্রমের নালা সারাইয়ের বরচ। পুরস্কার ঘোষণার পর সেই সংবর্ধনা সভা। সেদিন খুব হাওয়ার রাত। বোলপুর রাস পূর্ণিমার গোল হলুদ চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে শালবন। জোব্বার পকেট থেকে টেলিগ্রামের কাগজটা বের করলেন কবি। ভাঁজ খুলে বার দুয়েক পড়লেন। চেয়ে রইলেন দূর বনপথে। চোখে উদাস করা চাহনি।

তারপর উদাসীনভাবে নোবেল প্রাপ্তির টেলিগ্রামটা সচিবের দিকে এগিয়ে বললেন, 'নিন, নেপালবাবু। এই আপনার ড্রেন তৈরির টাকা!'

রবিঠাকুরের কথা শুনে নির্বাক আশ্রম-সচিব নেপালচন্দ্র রায়! দু-চোখের কোণ ভিজে এল তাঁর! নোবেল কমিটি কাছে কবির ঠিকানাই ছিল না! শেষে সুইডিশ অ্যাকাডেমি 'গীতাঞ্জলি'-র প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানির কাছ থেকে ঠিকানা নেয়। ১৪ নভেম্বর, ওরুন্দার লন্ডন থেকে কেবলগ্রাম পাঠায় ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ঠিকানায়।

কমিটি লেখে, 'Swedish Academy awarded you Nobel Prize Literature please wire acceptation Swedish Minister.'

১৫-র মধ্যরাতে জোড়াসাঁকোয় নোবেলের কেবলগ্রাম এল, ঘুমোতে পারেননি কবির শ্রেষ্ঠ জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সারা রাত্তির বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন, কখন আলো ফুটবে।

ঘড়িতে যখন সবে সকাল ৭-১০, নগেন্দ্রনাথ দৌড়ে গেলেন ডাকঘরে। তড়িঘড়ি টেলিগ্রাম করে শ্বশুরকে জানালেন তাঁর নোবেল প্রাপ্তির খবর!

কিন্তু জামাই নগেন্দ্রর ওই টেলিগ্রাম নয়, সেদিন কবি তাঁর তিন সুহৃদের টেলিগ্রামে নিজের নোবেল প্রাপ্তির খবর প্রথম জেনেছিলেন!

কবির নোবেল প্রাপ্তির খবর কলকাতায় প্রথম ছাপে ইংরেজি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা 'এম্পায়ার'।

১৩ তারিখ নোবেল-পুরস্কার কমিটি কবির নাম ঘোষণা করার পর, স্টকহোমের রয়টার প্রতিনিধি খবরটি প্রথম 'ব্রেক' করেন।

নিউইয়র্ক ইভনিং পোস্টে সে খবর প্রকাশিত হয়। এদেশের রয়টারে খবর এল পরের দিন, ১৪ নভেম্বর সকাল ৯টায়। ততক্ষণে সেদিনের কাগজ ছাপা হয়ে বেশিরভাগ বিক্রিও হয়ে গিয়েছে! সে দিনের 'এম্পায়ার' দেখেই শোরগোল পড়ে সন্ধেরাতের শহরে।

শোরগোলের কথা জানিয়েছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে সীতা দেবী। তিনি সেদিন কলেজ থেকে ফিরছিলেন।

'পুণ্যস্মৃতি'-র পাতায় লিখছেন, 'কলেজ হইতে ফিরিবামাত্র শুনিলাম যে রবীন্দ্রনাথ Nobel Prize পাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম কবিকে এই খবর টেলিগ্রামে জানাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে টেলিগ্রাম লিখিতে জানিতেন না, অন্য কাহাকেও দিয়া লিখাইতে গিয়া দেরি হইয়া গেল, তাঁহার আগেই আর-একজন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন।'

রাজপথে সেদিন কাগজের হকাররা ছোটাছুটি করে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধায়। জোড়াসাঁকো থেকে গড়ের মাঠ, হাটেবাজারে শুধু রবির জয়গাথা।

সেদিনের কথা পাওয়া যায় চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতেও।

চারু লিখছেন, 'আমি প্রবাসী-আপিসে প্রুফের স্তূপমধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি, বেলা তখন তিনটে হবে...।'

প্রেসের ভিতর সত্যেন্দ্র ঢুকেই চিৎকার করে চারুকে বললেন, 'আমি তোমায় মারব।'

কৌতুক দেখে প্রুফ সরিয়ে সত্যেন্দ্রর উচ্ছ্বাস দেখেন চারু।

হেসে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী এমন সুখবর যে আমায় মারতে ইচ্ছে করছে?'

'আন্দাজ করো!'

সত্যেন্দ্রর হাতে একতাড়া 'এম্পায়ার' কাগজ দেখে চিৎকার করে ওঠেন চারু! 'রবিবাবু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন!'

আনন্দের চোটে সত্যেন্দ্র কথার খেই হারিয়ে কাগজটা টেবিলে মেলে ধরলেন।

চারুচন্দ্র লিখছেন, 'আমি বললাম, 'রবিবাবুকে টেলিগ্রাম করেছ?' সত্যেন্দ্র বললেন, 'আমি নগেন গাঙ্গুলির কাছে এসপ্ল্যানেডে শুনেই কাগজ কিনে নিয়ে তোমাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি। টেলিগ্রাম তো আমি করতে জানি না—তুমি যা হয় করো।' তখন আমরা দুজনে ট্যাক্সি করে গিয়ে মণিলালকে খবর দিলাম। আর তিনজনের নামে রবিবাবুকে টেলিগ্রাম করলাম আমাদের সানন্দ প্রণাম জানিয়ে—Nobel Prize, our pranams। আমাদের টেলিগ্রামটা নগেনবাবুর টেলিগ্রামের আগে রবিবাবুর কাছে পৌঁছেছিল, তাতে সত্যেন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'টেলিগ্রাম করতে জানলে আমিই আগে খবর দিতে পারতুম!'

নোবেল প্রাপ্তির টেলিগ্রাম

সত্যেন্দ্র তখনও জানতেন না, তাঁদের টেলিগ্রামই কবির হাতে পৌঁছয় প্রথম। 'রবিজীবনী'-র লেখক প্রশান্তকুমার পাল লিখছেন, ''১৪ নভেম্বর রাত্রি ৭-৪৪ মিনিট পর্যন্ত বোলপুরে পৌঁছনো এরূপ টেলিগ্রামের সংখ্যা ৭টি, তার মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেলিগ্রাম বা রবীন্দ্রনাথ-কথিত বিলেতের প্রকাশকের কেবলগ্রাম কোনোটিই নেই। তবে 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' মারফত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একত্রে পাঠানো টেলিগ্রামটি পাওয়া যায়।'

কলকাতা ৪টে ১০ নাগাদ এই টেলিগ্রামটি জমা পড়ে। বোলপুর ডাকঘরে পৌঁছয় ঠিক তেত্রিশ মিনিট পর। কবির আমন্ত্রণে সেদিনই বেলা সাড়ে ১১টায় শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান কলেজের অধীন হাইস্কুলের অধ্যক্ষ পাদ্রী এডওয়ার্ড জন টমসন। পাদ্রীসাহেব বাংলা জানতেন। তাঁকে কবি বাংলাতেই চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সাহেব লিখছেন, "About 4 30 I had tea. He came in suddenly and said, 'Mr. Thomson, will yo excuse me for a few hours ? I have to go somewhere."

অতিথি টমসনের কাছ থেকে সময় নিয়ে কোথায় গেলেন রবীন্দ্রনাথ? বনবিহারে।

রেল লাইনের পুব পাড় থেকে মোটর গাড়িতে চড়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চললেন পারুলবনের দিকে।

সঙ্গে কয়েকজন বিদেশি অতিথি, এসরাজ নিয়ে গানের ভাণ্ডারী দিনুঠাকুর, ছেলে রথি আর সচিব নেপালচন্দ্র।

পথেই দেখা হল, বোলপুরের ডাক পিয়োনের সঙ্গে। কবিরা তাঁকে দেখে গাড়ি থামাতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোনও সংবাদ আছে?'

'আজ্ঞে। কলকাতা থেকে তার আছে আপনার।'

এরপর টেলিগ্রাম হাতে পেয়েও কবি তখনই খুললেন না। সকলের দেরি হবে ভেবে জোব্বার পকেটে রেখে দিলেন কাগজখানা। কিন্তু সকলের কৌতূহল থামে না। এখন টেলিগ্রাম!

সবার অনুরোধ চাঁদের আবছা আলায় কম পথেই টেলিগ্রাম খুললেন কবি। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি!

তিনি প্রিয় মানুষ পাঠানো সু-সংবাদ পড়ে বলেন, 'উঁহু, সম্ভবত টেলিগ্রামের ভাষায় ভুল আছে বুঝলে!'

সকলের উৎসুক চোখ কবির মুখের দিকে!

ফের পড়লেন তিনি।

তারপর নেপালবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন কাগজখানা। রথীন্দ্র দেখলেন কাগজে লেখা, 'নোবেল প্রাইজ কনফার্ড অন ইউ, আওয়ার কনগ্রাচুলেশনস।'

একআকাশ চাঁদের সে রাতে আশ্রমের চতুর্দিকে কেবল রবিরব। পূজোর ছুটির পর সবে খুলেছে রবিবাবুর 'গানের স্কুল।'

বাড়ি থেকে ফিরে ছুটির হোম-টাস্ক নিয়ে মনখারাপ ছেলেদের। তারই মাঝে সন্ধেরাতের হাওয়ার রটল কবির নোবেল প্রাপ্তির খবর।

সে সময় প্রমথনাথ বিশী শান্তিনিকেতনের ছাত্র। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন'-এ তিনি লিখছেন, 'শীতের প্রারম্ভে নূতন-ওঠা বেগুনভাজা পরিবেশিত হইয়াছে...সহসা অজিতকুমার চক্রবর্তী রান্নাঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'গুরুদেব নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।'

প্রাক্তনীর স্মৃতির পথে ফিরে দেখি, আশ্রমের অধ্যাপক অজিত চক্রবর্তীর চলাফেরা প্রায় নৃত্যের তালে পরিণত হয়েছে। চঞ্চল হয়ে উঠেছেন 'গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, চলাফেরায় সংযত' ক্ষিতিমোহন সেন। বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায় এসে যখন তিন-চার দিনের ছুটি ঘোষণা করলেন, তখন ছাত্ররা বুঝতে পারল, 'ব্যাপার কিছুও হবে!'

প্রমথ লিখছেন, 'কোথায় গেল ক্লাসের নিয়মিত ঘণ্টা, কোথায় গেল অধ্যাপকদের গম্ভীর চালচলন, স্নানাহারের সময়ও গোলমাল হইয়া গেল!'

সেই রাতে গৌরপ্রাঙ্গণে চাঁদের আলোয় বিস্তর আমোদ করেছিল আশ্বহার শান্তিনিকেতন আশ্রম।

পিয়ার্সন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কাফ্রিদের ঢাল-তরোয়াল-মুখোশ এনেছিলেন। সে সব তিনি বের করে দেন আনন্দ-নৃত্যের জন্য। পিয়ার্সন ও ছেলেদের নাচের মাঝেই কালি-ঝুলি মেখে সং সেজে হাজির হলেন সুধাকান্ত। কোমরে তাঁর জড়ানো খুন্তের গন্ধ দড়ি!

তাই নিয়ে কী লম্ফ-ঝম্ফ!

কবি অবিচল থাকলেও, সেদিন এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন আশ্রম সদস্য ও তাঁর আপনজনেরা। কবির বড়দাদা, অবিশ্রান্ত দ্বিজেন্দ্রনাথও খবর পেয়ে তাঁর নীচু বাংলোর ঘর থেকে দৌড়ে গিয়েছেন কবিকে বুকে জড়িয়ে ধরতে! আদর করে বলেছেন, 'রবি, তুই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিস!'

বোলপুরের ডাকঘর উপচে পড়ছে অভিনন্দন বার্তায়। অজস্র চিঠি-টেলিগ্রাম! খুব কাছের কয়েকজনকে কবি নিজেই উত্তরে লিখলেন। বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখলেন, ''সম্মানের ভূতে আমাকে পাইয়াছে, আমি মনে মনে ওঝা ডাকিতেছি—আপনাদের আনন্দে আমি সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিতেছি না। আপনি হয়ত ভাবিবেন এটা আমার অত্যুক্তি হইল কিন্তু অন্তর্যামী জানেন আমার জীবন কীরূপ ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। 'কোলাহল ত বারণ হল / এবার কথা কানে কানে' এই কবিতাটি দিয়া আমি গীতাঞ্জলির ইংরেজ তর্জমান শুরু করিয়াছিলাম। তারপরটা যে কতদূর সফল হইল তারা দেখিতেই পাইতেছেন।' লিখলেন রোটেনস্টাইনকেও! অভিনন্দন পাঠানো হল, রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে লেখা চিঠির বয়ান।

২৩ নভেম্বর কবিকে সংবর্ধনা জানাতে বিশেষ ট্রেন এল বোলপুরে! সে ট্রেনের খবর জানিয়ে কাগজে বিজ্ঞপ্তি বের হয়। জানানো হয়, শান্তিনিকেতন যাওয়ার ভাড়া ৩ টাকা চার আনা! কে নেই বিজ্ঞপ্তির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে ব্রজেন শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার। সু-সজ্জিত রেলগাড়ি হাওড়াতে ৫৫ মিনিট দেরি হয়।

কারণ সভাপতি জগদীশচন্দ্র বসু স্টেশনে পৌঁছতে পারেননি।

দুপুরে ট্রেন যখন বোলপুরে এল, কবির নামে জয়ধ্বনি উঠল বোলপুরের ভুবনডাঙার আকাশ জুড়ে।

আম্রকুঞ্জে সংবর্ধনা সভায় কবি এলেন গরদের ধুতি পাঞ্জাবিতে, তাঁকে মালা পরিয়ে দিলেন সভাপতি জগদীশচন্দ্র। কবি বসলেন মাটির বেদিতে, পদ্মপাতায়। রেশমের কাপড়ে কবি সত্যেন্দ্র দত্তের খসড়া করা অভিনন্দনপত্রটি পড়লেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। একটি অঞ্জলাবতী গাছের গাছ উপহার দিলেন জগদীশচন্দ্র।

সকলের অভিনন্দন শেষে এবার কবির পালা।

কবি গাইবেন মাস তিনেক আগে লেখা গীতিমাল্যের একটি গান, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

কিন্তু হঠাৎ খুব রেগে গিয়ে গানের দলকে থামিয়ে দিলেন তিনি! আম্রকুঞ্জের সভায় ছিলেন সীতা দেবী। তিনি লিখছেন, 'বোধ হয় আর কিছু বলবার সংকল্প প্রথম তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে প্রিয়তমের মতো ভালোবাসিয়াছে এমন বাঙালিরও যেমন অভাব নেই, এবং ছিলও না, তেমনি চিরকাল তাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়াছে এবং লোকচক্ষে হীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন বাঙালিরও অভাব তখন ছিল না।'

এরপর ১৬ পাতায়

আমেরিকায় বসন্তকাল

১৪ পাতার পর

মরগেট-মি-নট, গাদাটে গার্ডেনিয়া আর হরেক রঙের প্যানজি ও পপির কথা উল্লেখ করতেই হয়। গুচ্ছগুচ্ছ মনপসন্দ ফুলেরা হচ্ছে ক্রিস্থইমপেশেন্ট, জিরেনিয়াম আর সুপরিচিতি মেরিগোল্ড বা গাঁদাফুল। পিওনি, ক্যামেলিয়া, লিলি অব দি ভ্যালি ফুলের কথা কি বলেছি আপনাদের? এজেই রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলেছেন, ''শেষ নাহি যে, শেষকথা কে বলবে?''...।

প্রাণী জগতের মনের ভিতরে বসন্তের অর্থ এক এক দলের কাছে এক এক রকম। বংশবিস্তারটা আসল উদ্দেশ্য হলেও আনন্দের ক্রিয়াকলাপগুলো দলভেদে একটু আলাদা গোছেরই হয়। যেমন মৌমাছিদের কাছে বসন্তের মানে হচ্ছে ফুলের মধুসন্ধান। পরিবর্তে তারা কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন দিয়ে যায়। অপরপক্ষে ফুলেদের কাছে বসন্তের অর্থ হলো পরাগসংযোগ। ফুলেরা তাই পোকামাকড়দের আহ্বান করবার জন্য মিষ্টি মধুরগোল্ড দেখায়। নানান রঙে ফোটে। এক কথায় হাজার আশাশার বাজার বসায়।..

ছোট প্রাণীদের দক্ষতা বসন্তকে উপভোগ করে তাদের শারীরিক চঞ্চলতা দিয়ে। প্রায়শই সেই উচ্ছলতাকে সাহচর্য দেয় তাদের দিগন্তবিস্তারী মহাসংগীত। উষাকালে পাখিদের গানে সেই মহাসংগীতের আত্মপ্রকাশ। মধ্যদিনে কাঠবিড়ালীদের রং-তামাশায় তার আনন্দবৃষ্টি। অপরাহ্নে প্রাম্যকুক্কুটের কুউউ-কুউউ ধ্বনিতে তার আবেশী তৃপ্তি। গোধূলিতে হাঁসেদের পক্ষবিধূননে তার মতো খেলা। মধ্য-নিশার নিশ্চুপ ঘুমে তার মতো আনে শান্তি। প্রভাতের কলকাকলি যদি হয় সেই মহাসংগীতের আলাপ, তাহলে অপরাহ্নে মন্দ্র মুমূর্ধ্বনিতে তার বিস্তার আর রাত্রির ঝিঁঝিঁরবে তার ঝালা।

বসন্ত তোর শেষ করে দে, শেষ করে দে রঙ্গ
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার উদ্দাম তরঙ্গ...
ঝরবার আগে জরেছিলো যত ফলাবার সাধন ধরো
হেলা-ফেলার পালা এবার, এই খেলা হোক ভঙ্গ।।

রবীন্দ্রনাথের গানের টানে ঋতু পরিবর্তনের খ্যাপামি একসময় শেষ হয়। গ্রীষ্মের আহ্বানে বায়ু-তরঙ্গে পরিষ্কার ধাতবধ্বনির সংকেত আসে। তবু বেঁচে থাকার উদ্যমই হচ্ছে অপরিসীম প্রাপ্তি। প্রকৃতির এই অপরিসীমতারই অন্য নাম হলো বসন্ত। এক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ''বসন্তকে যেমন কুঁড়ি ধরাতে হয় হাজারে হাজারে সমাজকে তেমনি মানুষ খোয়াতে হয় হাজারে হাজারে। যৌবনের জয়গান যেমন চির আদরণীয়, তেমনি বসন্তের উৎসবময়ী উদ্দামতা হচ্ছে চির আকাঙ্ক্ষিত। মানুষের সঙ্গে মিল আছে বলেই প্রকৃতি যখন উৎসবময়ী সাজে, মানুষ তখন কাজকর্ম ফেলে রাখে তার সাজ দেখবার জন্য।'

আমেরিকার যৌবনভজনা কিংবদন্তীর পর্যায়ে। কী জীবনে কী জীবনযাত্রায় ওদের এই যৌবনপ্রীতির যেন শেষ নেই। তাই প্রকৃতিদেবী যখন প্রতি বসন্তে নব যৌবনে সুধাভাণ্ড বয়ে নিয়ে আসেন তখন আমেরিকানরা হয়ে যান মাত্রাহীন দিশাহারা। মুখে তার বুঝি রবীন্দ্রনাথের 'এসো হে এসো হে, আমার কান্তএসো।'

আমেরিকায় বসন্তকাল যেমন আনে নানা রঙের মেলা, আমেরিকানদের তেমনি শুরু হয় নানান ঢং-এর খেলা। তখন মনের বিদ্যুৎ চমকায়, মনের কামিনী ধমকায় আর শীতাক্রান্ত আমেরিকানদের হয় নব জাগরণ। গার্হস্থ্যের অবগুন্ঠনের মধ্যে এসে পড়ে উত্তেজনার রোদ। দীপ্ত সূর্যের ঝিকিমিকি আলো, ইপ্সিত যৌবনচর্চারই আমন্ত্রণ জানায় রবীন্দ্রসংগীতে তাই শুনি বাজছে

''মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজে
কোন নব চঞ্চল ছন্দে
মম, অন্তর কম্পিত আজি, নিখিলের হৃদয়স্পন্দে...।

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে স্বয়ং লিখেছেন, 'বসন্তে আছে যৌবনের আমন্ত্রণ সোহানা রাগিনীর রাঙা রঙে রঞ্জিত মাতার ফুলের দলে লেখা আছে বসন্তের মন্ত্রলিপি।'' আমেরিকায় যখন বসন্তকাল আসে তখন মনে হয় আমেরিকানবাসীরা ঐ শাশ্বতবাণিতেই বিশ্বাসী।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর গানে আর লেখায় সেই বসন্তকালকেই যেন আকুল সুরে ডাকছে। এইটেই তো জীবন, সবাই বলে। এত চোখে পড়া দৃশ্য ছেড়ে কি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে? এই আনন্দ ভাণ্ডার থেকেই যা সহজেই পাওয়া যেতে পারে তা হলো এক গভীর আনন্দময় আবেশ।

আনন্দম! আনন্দম!! আনন্দম!!!

ছোটবেলায় রবি ঠাকুর

অজিত ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছিল যে বাড়িতে—তার পাশে ছিল একটি পুকুর। তাতে লোকেরা স্নান করতো, খাবার পানীয় জল নিতো। ঘরের জানালা দিয়ে পুকুরঘাট ও পাড়ের একটি বটগাছ দেখা যেতো।

জানালার পিছনের একটি চেয়ারে বসে কবি বাইরের দৃশ্য দেখে-দেখে কবিতা লেখা শুরু করলেন বলা যায়। কবিকে জানালার সামনে একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে চাকর মনোহর মেঝেতে খড়ি দিয়ে চেয়ারের বাইরে অর্ধচন্দ্রাকার রেখা এঁকে বলতো—এই গণ্ডির বাইরে গেলে বিপদ! রবিঠাকুর রামায়ণের গল্পে শুনেছিলেন, বা পড়েছিলেন—গণ্ডির বাইরে গিয়ে সীতার বিপদ। তাই 'গল্পে'অবিশ্বাস করতে পারতেন না। ঐ গণ্ডির বাইরে যা দেখতেন তাই তাঁর কবিতায় লিখতেন। পুকুরের ওপারে পাখিদের গাছতলায় খেলা এইসব, বটগাছকে সাক্ষী রেখে—

নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছো মাথায় লয়ে জট,
ছোট্টছেলেটি মনে কী পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।
কত পাখী তোমারি শাখে বসে যে চলে গেছে,
ছোটছেলেরে তাদেরি মত ভুলে কী যেতে আছে?
মনে কী নেই সারাটা দিন বসিয়া বাতায়নে।
তোমার পানে রইতো চেয়ে অবাক দুনয়নে!
তোমার তলে খেলাধুলা তোমার তলে ছুটি
তোমার তলে নাচতো বসে শালিখ পাখী দুটি?

নেয়াখং বসিয়া বাড়ির দরজী কবির পাঞ্জাবীর পকেট করত না, এটা রবি কবিকে কিছু বেদনা দিয়েছে।

রবি-কবির ক্লাশের টিচার যখন শুনলেন তাঁর ছাত্র কবিতা লেখে, তখন তিনি তার উৎসাহের জন্য বোর্ডে লিখলেন—

রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই

ছাত্র রবিঠাকুর তার তলায় লিখলেন—
'মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জল ক্রীড়া করে।'
ছোট ছেলে-মেয়েদের ঠাকুর যে কবিতা লিখেছেন তার একটি দিলাম—

তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকিমারে আকাশে।
মনে সাধ কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
একেবারে উড়ে যায়—
কোথা পাবে পাখা সে।
তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে—
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার
মনে মনে ভাবে বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।।

সারাদিন ঝর্ ঝর্ থরথর
কাঁপে পাতা পত্তর
ওড়ে যেন ভাবে ও—
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তারাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।।

তারপরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি।
যেই ভাবে মা যে হয় মাটি তার,
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোনটি।

নোবেলের সেই দিন

১৫ পাতার পর

সভার সামনের সারিতে বসেছিলেন তেমন অনেকজন। কবি তাঁদের দেখে ইর্ধৈর্য হারান!

উঠে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, '...আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই।'

বক্তচর্চিত সে সভার স্মৃতিপাঠে কেউ কেউ এমনও লিখেছেন, কবি সেদিন বক্তৃতায় সংবর্ধনাকারীদের তুলনা করেছিলেন সেই সব গ্রাম্য বালকদের সঙ্গে, যারা কুকুরের লেজে টিন বেঁধে রাস্তায় তাড়া করে বেড়ায়! কেবল লোকের মুখের কথা নয়, নিজেও লেখেন এমন কথা মর্মদাহে!

তাঁর অভিভাষণে সভায় মৃদু গুঞ্জন ওঠে। অনুগামীরা কেউ কেউ না খেয়েই ট্রেন ধরতে গেলেন বোলপুর স্টেশনে।

কবি তাঁদের জন্য মণ্ডা-মিঠাই-কমলালেবু পাঠিয়ে দেন ট্রেন ছাড়ার আগে! গভীর বেদনা আর অভিমানে কয়েক দিন পরে লিখতে গেলেন, 'লুকিয়ে আসে আঁধার রাত'।

আপন কথায় বাঁধছে গাইবেন, 'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে!'

এই আমাদের রবিঠাকুর!

(সংগৃহীত)

সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী

সীমা ব্যানার্জ্জী-রায়

"সাধের কাননে মোর
রোপণ করিয়াছিনু
একটি লতিকা, সখী,
অতিশয় যতনে।"

রবীন্দ্রজীবনী পড়ার সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের নিয়ে কৌতূহল আমার মনে দানা বেঁধেছিল। পড়ে ফেলেছিলাম চিত্রা দেবের লেখা বেশ কিছু বই। বইয়ের পাতা থেকে আজ কিছুকথা আঁকতে ইচ্ছে হল কবিপত্নীকে নিয়ে। আমার কাছে চরিত্রটি যেমন শান্ত তেমনি আকাশের ধ্রুবতারার মতো জ্বলজ্বল করে কবির নামের সঙ্গে-সঙ্গেই। বিদেশীদের কৌতূহল-এর শিকার হতে হয়েছে বেশ কয়েকবার কবি পত্নীকে নিয়ে। আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস তাদের তৃষ্ণা কিছুটা মেটাতে পারে মনে হয়, যখন তাদের বিস্ময়ের বিস্ফারিত চোখ দুটি দেখি। আমার লেখা এই শব্দদের মধ্যে সেই শান্তিত তৃপ্তভূমি আমার মনের অতীত দিন সম্পদে বাসা বাঁধে। মাঝে মাঝে প্রশংসাকিরণ পাই। মাঝে মাঝে চিন্তিত আদরে ভাঁজ খুলি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের চারপাশে অতি সরব আর সচ্চার চিত্রগুলির পাশে কবি পত্নী মৃণালিনীর নির্বাক ভূমিকাটি আমাদের কাছে মাঝে মাঝে প্রশ্নের কড় যে তোলে না, তা নয়। অন্তর্বাণী মানবোনা হয়ে থাকে। তবে নবজাগরণের পটভূমি থেকে আমরা ঠাকুরবাড়ির অন্য চরিত্র গুলোর সঙ্গেই বেশি পরিচিত। তাই নয় কি?

তবে বাংলাদেশের কয়েকজন আদর্শ জননীর পাশে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মাতৃমূর্তিটি চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। তিনি ছিলেন সনাতন ভারতবর্ষের—শাশ্বতী নারী, সামান্যার মধ্যে অসামান্যা। তাই বোধহয় 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থ লেখবার সময় রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন, "মহৎ পুরুষের ইতিহাস বাহিরে নানা কার্যে এবং জীবনে বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস...তাঁহার স্বামীর কাছে রচিত হইয়া থাকে; এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না।'

এরই মধ্যে মৃণালিনীর আসল পরিচয় খুঁজে পাই। তিনি রবীন্দ্রজীবনে, ঠাকুরবাড়িতে, শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয়ে মিশে আছেন ধূপের সুরভির মতো। দেখা যায় না, অনুভবে মন ভরে যায়। তিনি ছিলেন আদর্শ, সু-গৃহিণী, সুরসিকা, পরিহাসপ্রিয়া, আমুদিনী, দরদিনী, সহনশীলা, উদারমনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মৃণালিনী দেবীর যে নীরব ভালোবাসার মন ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে মৃণালিনীকে নিয়ে বেশি কিছু লেখালিখি করতে পারেননি। সাংসারিক জীবনে সুখে-দুঃখে, সঙ্কটে-সংগ্রামে এই নারী মৃণালিনী দেবী থেকেছেন কবির পাশে। আর আমাদের শিখিয়ে গেছেন "সহনশক্তি" কাকে বলে? সহধর্মিণীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা কি ছিল জানতে ইচ্ছে করে নিশ্চয়ই। কী ভাবে তিনি তাঁদের যৌথ জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন সেকথা জানা যায় মৃণালিনীকে লেখা কবির পত্র পড়ে। তাই বোধ হয় তিনি মৃণালিনী দেবীকে লিখেছিলেন—

"ভাই ছুটি"

আমাকে সুখী করবার জন্য তুমি বেশি কোন কষ্ট কোরো না—আন্তরিক ভালোবাসাই যথেষ্ট। অবশ্য তোমাতে আমাতে সকল কাজ ও সকল ভাবেই যদি যোগ থাকত খুব ভাল হত—কিন্তু সে কারো ইচ্ছায়ও নয়। যদি তুমি আমার সঙ্গে সকল রকম বিষয়ে—সকল রকম শিক্ষায় যোগ দিতে পারো তো খুসি হই—আমি যা কিছু জানতে চাই তোমাকেও জানাতে পারি—আমি যা শিখতে চাই তুমিও আমার সঙ্গে শিক্ষা কর তাহলে সব সুখের হয়। জীবনে দুজনে মিলে সকল বিষয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়—তোমাকে কোন বিষয়ে আমি ছাড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করিনে—কিন্তু জোর করে তোমাকে পীড়ন করতে আমার শঙ্কা হয়। সকলেরই স্বতন্ত্র রুচি অনুরাগ এবং অধিকারের বিষয় আছে—আমার ইচ্ছা ও অনুরাগের সঙ্গে তোমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ মেলাবার ক্ষমতা তোমার নিজের হাতে নেই—সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খুঁৎখুঁৎ না করে ভালবাসার দ্বারা যত্নের দ্বারা আমার জীবনকে মধুর—আমাকে অনাবশ্যক দুঃখকষ্ট থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করলে সে চেষ্টা আমার পক্ষে বহুমূল্য হবে।"

কবির প্রত্যাশা পুরোপুরি পূর্ণ করেছিলেন মৃণালিনী দেবী।

জীবনের সবক্ষেত্রে এমনকি শান্তিনিকেতনে আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাসনা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেখানে গেলে মৃণালিনীও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় আত্মীয় স্বজনেরও উপদেশ, উপহাস, বিরূপতা, বিদ্রূপ সবই সহ্য করতে হয়েছিল। নাবালক পাঁচটি সন্তান, তার মধ্যে তিনটি মেয়ে অথচ কবি তাঁর যথাসর্বস্ব ঢেলে দিচ্ছেন আশ্রম বিদ্যালয়ে। লোকে বলবেনা কেন? মৃণালিনীর মনেও এ নিয়ে ভাবনা ছিল, তবু তিনি স্বামীকে সব কাজে হাসিমুখে সাহায্য করেছেন। যখনি কোনো প্রয়োজন হয়েছে, তখনই খুলে দিয়েছেন গায়ের এক একটি গয়না। মৃণালিনী পেয়েছিলেন প্রচুর। বিয়ের যৌতুকের গয়না ছাড়াও শাশুড়ীর আমলের ভারী গয়না ছিল অনেক সেসবই তিনি কবির কাজে গা থেকে খুলে দিয়েছিলেন।

তাঁর ছেলে রথীন্দ্র লিখেছেন, 'শেষ পর্যন্ত হাতে কয়েক গাছি চুড়ি ও গলায় একটা চেন হার ছাড়া তাঁর কোন গয়না অবশিষ্ট ছিল না।'

শুধু গয়না দিয়ে না, আশ্রমের কাজেও মৃণালিনী স্বামীকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। আধুনিক অর্থে তাঁকে হয়ত প্রগতিশীলা বলা যাবে না কারণ, শিক্ষা-দীক্ষায় ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের ছাড়িয়ে অন্যান্য মেয়েরা ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

১

কী করে ভবতারিণী একদিন হারিয়ে গেলেন মৃণালিনীর মধ্যে? কেনই-বা এই নাম পরিবর্তন? যদিও এই পরিবর্তন কোনো আলোড়ন আনল না বহির্জগতে। একটুও রং ছড়াল না প্রগতিশীলাদের মনে। তবু মৃণালিনীকে সামান্য বলতে পারা যায় না। মাত্র দশ বছর বয়সে একহাত ঘোমটা টেনে যে ভবতারিণী ঠাকুরবাড়িতে ঢুকেছিলেন সেদিন তিনি বুঝতেও পারেননি কোন বাড়িতে তাঁর বিয়ে হচ্ছে, কাকে পেলেন তিনি!

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, 'আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই।"

—কেন গল্প নেই? প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

—আমার বিয়ে যা-তা করে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিকে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল বড় মাপে।

জ্ঞানদানন্দিনী, কাদম্বরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সদলবলে মেয়ে খুঁজতে গেছিলেন যশোরে। কিন্তু বৌঠাকুরাণীদের মনের মতো সুন্দরী মেয়ে পাওয়া গেল না। তাই শেষকালে ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী বেণীমাধব রায়ের বড় মেয়ে ভবতারিণীর সঙ্গেই বিয়ে ঠিক করা হল। বিয়ে হল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতেই ১৮৮৩ সালে ৯ই ডিসেম্বর।

বিয়ে করে আনলেন অজ্ঞ নাবালিকা ভবতারিণীকে। তাঁকে 'স্বর্ণ মৃণালিনী' হবার আশীর্বাদ করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির বাসর ঘরের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় প্রত্যক্ষদর্শী হেমলতার লেখায়।

"বাসরে বসেই রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি আরম্ভ করলেন। ...। ভাঁড় খেলার বদলে ভাঁড়গুলো উপুড় করে দিতে লাগলেন ধরে ধরে। তাঁর ছোট কাকীমা ত্রিপুরাসুন্দরী বলে উঠলেন,

"ও কি করিস রবি? এই বুঝি তোর ভাঁড় খেলা? ভাঁড়গুলো সব উল্টেপাল্টে দিচ্ছিস কেন?"...

রবীন্দ্রনাথ বললেন—'জানো না কাকীমা—সব যে ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি ভাঁড়গুলো উলটে দিচ্ছি।'...

কাকীমা আবার বললেন, "তুই একটা গান কর। তোর বাসরে আর কে গাইবে, তুই এমন গাইয়ে থাকতে?" এরপর তাঁর বাসরঘরে একবার উঁকি দিলে দেখা যাবে সেখানে তিনি ওড়নাঢাকা জড়সড় বধূর দিকে চেয়ে কৌতুক করে গান ধরেছেন, "আ মরি লাবণ্যময়ী... ।"

শোনা গেছে, কবির প্রচণ্ড মজারে টান থাকায় ভবতারিণী প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন কথাই বলতেন না। কবি কি এই অসম বিবাহকে খুশি মনে গ্রহণ করেছিলেন? তাই তো মনে হয়। ছোট ছোট ঘটনায় রয়েছে সুখের আমেজ।

আবার ও আর একভাবে ভবতারিণী একদিন হারিয়ে গেলেন মৃণালিনীর মধ্যে?

প্রথমে তিনি মহর্ষির নির্দেশে ঠাকুর বাড়ির আদব-কায়দা-চালচলনের ঘরোয়া তালিম নিলেন নীপময়ীর কাছে। তারপর নীপময়ীর মেয়েদের সঙ্গে তিনিও পড়তে গেলেন লরেটো হাউসে। এরই মধ্যে শুরু হল ভবতারিণীর মৃণালিনী হয়ে ওঠার শিক্ষা।

যুগপ্রভির ভবতারিণী হয়তো হারিয়ে গেলেন কিন্তু মৃণালিনী অতি আধুনিকা হয়েও ওঠেননি কিংবা তাঁর লরেটোর ইংরাজি শিক্ষা, পিয়ানো শিক্ষা, বাড়িতে হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের কাছে সংস্কৃত শিক্ষা কোনো সৃষ্টিমূলক কাজেও লাগেনি। কারণ তাঁর জীবন-সংসারের সকলের সুখে নিমজ্জিত ছিল। তিনিও বাড়ির মেয়ে-বৌদের মতো অভিনয় করেছেন, রামায়ণ অনুবাদ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে রূপকথা সংগ্রহ করেছেন, আমোদ-প্রমোদের দুঃখে-শোকে সবার, সবচেয়ে বেশি কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

২

তাঁর প্রকৃত পরিচয় আমরা পেলাম...যখন স্বামীর মহৎ আদর্শকে কাজে পরিণত করবার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখন শুধু তাঁর প্রকৃত পরিচয় প্রথমবার আমরা পেলাম। তিনি ছিলেন সুগৃহিণী। সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন রান্না করতে, আর পাঁচজনকে ভালোমন্দ রেঁধে খাওয়াতে। তিনি নানারকম মিষ্টি তৈরী করতে পারতেন। তাঁর মানকচুর জিলিপি, দইয়ের মালপো, পাকা আমের মিঠাই, চিঁড়ের পুলি যাঁরা একবার খেয়েছেন—তাঁরা আর ভোলেননি।

স্ত্রীর রন্ধন নৈপুণ্যে কবিও উৎসাহী হয়ে মাঝে মাঝে নানারকম উদ্ভট রান্নার 'এক্সপেরিমেন্ট' করতেন। শেষে হাল ধরে সামাল দিতে হত মৃণালিনীকেই। তাঁকে রাগাবার জন্যে কবি বলতেন, 'দেখলে, তোমাদের কাজ তোমাদেরই কেমন একটা শিখিয়ে দিলুম'।

মৃণালিনী চটে গিয়ে বলতেন, "তোমাদের সঙ্গে পারবে কে? জিতেইত আছ সকল বিষয়ে।" তিনি নিজে সাজতে ভালোবাসতেন না। কিন্তু জোড়াসাঁকোয় সবাইকে সাজাতেন। জোড়াসাঁকোর সবার ছোট। তবু সবাই তাঁর কথা শুনতেন।

সবাইকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতেন, বৌদের সাজাতেন কিন্তু নিজে সাজতেন না। সমবয়সিরা অনুযোগ করলে বলতেন, 'বড় বড় ভাজ-পো, ভাগ্নেরা চারিদিকে ঘুরছে-আমি আবার সাজব কি?' একদিন কানে দুটি ফুল ঝোলানো বীরবৌলি পরেছিলেন সবার উপরোধে। সেইসময়ে হঠাৎ কবি উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুহাত চাপা দিয়ে বীরবৌলি লুকিয়ে ফেলেছিলেন। গয়না পরায় এতই ছিল তার লজ্জা।

লেখাপড়া শেখার পর শিলাইদহে বাস করবার সময় মৃণালিনী কবির নির্দেশে রামায়ণের সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছিলেন। শেষ হয়নি। কবি সেই অসমাপ্ত খাতাটি তুলে দিয়েছিলেন বড় কন্যা মাধুরীলতার হাতে, বাকিটুকু শেষ করার জন্য। পুত্র রথীন্দ্রের কাছে আরো একটি খাতা ছিল-তাতে মৃণালিনী মহাভারতের কিছু শ্লোক, মনুসংহিতা ও উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ করেন। এছাড়া কবির নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের রূপকথা সংগ্রহের কাজেও হাত দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ

এরপর ১৮ পাতায়

সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী

১৭ পাতার পর

ঠাকুর তাঁর সংগ্রহ থেকেই পেয়েছিলেন ''ক্ষীরের পুতুল'' গল্পটি। মৃণালিনী ঠিক যেমন করে গল্পটি বলেছিলেন ঠিক তেমনি করেই লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপকথার যাদুকরের সেদিন হাতেখড়ি হল মৃণালিনীর কাছেই। সকৃতজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,''এই আমার রূপকথার আদিকথা।''

কিন্তু মৃণালিনীর লেখা আর কিছু কি ছিল? রবীন্দ্রনাথ-এর ভগিনী স্বর্ণকুমারীকে এ নিয়ে একবার প্রশ্ন করা হলে তিনি দৃঢ়ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ''তাঁর স্বামী বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক, সেইজন্য তিনি স্বয়ং কিছু লেখা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।''

৩

খুবই সত্যি কথা, তবু মনটা খুঁতখুঁত করে বৈকি। মনে নানান প্রশ্নের জাল বোনা হয়।

ঠাকুরবাড়িতে এই আমুদে বৌটি কি তাঁর মনের মধু সবটাই রেখে দিয়েছিলেন নীরব সেবায়! তাদের সীমা পেরিয়ে কিছুই কি আমাদের কাছে এসে পৌঁছবে না? দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতার লেখা থেকেই শুধু পাওয়া যায় মৃণালিনী দেবীকে?

সৌভাগ্যে মৃণালিনীর একটি-দুটো চিঠি অবশ্য রক্ষা পেয়েছে। সেই ছোট্ট সাংসারিক চিঠির মধ্যে তাঁর পরিহাসপ্রিয় সহজ মনটি ধরা পড়েছিল। সুধীন্দ্রনাথেরও স্ত্রী চারুবালাকে লেখা একটি চিঠিতে দেখা যাবে মৃণালিনী তাঁকে অনুযোগ করেছেন অনেকদিন চিঠি না লেখার জন্য।

তার মধ্যে যে অনাবিল স্বচ্ছতা আছে তার সৌন্দর্য বুঝি কোনো সাহিত্যিক চিঠির চেয়ে কম নয়।

''...তোমার সুন্দর মেয়ে হয়েছে বলে বুঝি আমাকে ভয়ে খবর দাওনি পাছে আমি হিংসা করি, তার মাথায় খুব চুল হয়েছে শুনে পর্যন্ত 'কুন্তলীন' মাখতে আরম্ভ করেছি, তোমার মেয়ে মাথা ভরা চুল নিয়ে আমার ন্যাড়া মাথা দেখে হাসবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না। সত্যি বাপু, আমার বড় অভিমান হয়েছে, না হয় আমাদের একটি সুন্দর নাতনিই হয়েছে, তাই বলে কি আর আমাদের একেবারে ভুলে যেতে হয়।''

হেমলতা লিখেছেন।

''কবিপত্নী একবার সাধ করে সোনার বোতাম গড়িয়েছিলেন কবির জন্মদিনে কবিকে পরাবেন বলে। কবি দেখে বললেন, ছি ছি ছি, পুরুষে কখনো সোনা পরে লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি। কবিপত্নী সে-বোতাম ভেঙে ওপাল-বসানো বোতাম গড়িয়ে দিলেন। দু-চার বার কবি সেটি ব্যবহার করেছিলেন যেন দায়ে পড়ে।''

এখানেই বোঝা যায় মৃণালিনী দেবীর সহনশীলতা। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে বর্তমান বিবাহিতা নারীরা এই ব্যবহারটিকে ঠিক কি চোখে দেখতেন কে বলতে পারে?

...''সুলক্ষ্মী বধূ, সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু! আহা!

সত্য রহো তুমি প্রেমে, ধ্রুব রহো ক্ষেমে—
দুঃখে সুখে শান্ত রহো হাস্য মুখে''...

শান্তিনিকেতনে চলে গেলেও জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবারটির জন্যে মৃণালিনীর আন্তরিকতা কখনও হ্রাস পায়নি। শিলাইদহে তাঁর কাছেই ছুটে যেতেন ভাশুরপো ও ভাশুরঝিরা। বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইংরেজী, বাংলা যখন যে বই পড়তেন কাকীমাকে পড়ে শোনাতেন। শুধু কি আত্মীয় স্বজন? না তিনি সবার সুখেই সুখী আবার সবার দুঃখের সমদুঃখী।

শিলাইদহে একদিন মুন্না সিং নামে এক পাঞ্জাবী তাঁর কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে নিজের দুঃখদুর্দশার কথা জানিয়ে বলল।

''মাইজি, একটি চাকরি দিয়ে আমাকে রক্ষা করুন, নতুবা আমি সপরিবারে মারা পড়িব।''

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে ছিলেন না, মৃণালিনী তাকে কুঠিবাড়ির দারোয়ানের কাজে বহাল করলেন।

কদিন পরে দেখলেন মুন্না সিং তখনো বিষণ্ণ। মৃণালিনী দেবী কারণ জানতে চাইলেন। সে জানাল—তার মাইনের সবটাই খরচ হয়ে যায় দুবেলা চার সের আটার রুটি খেতে। করুণাময়ী মৃণালিনী সেইদিন থেকে তাঁর সংসার থেকে মুন্না সিং-এর জন্য চার সের আটা বরাদ্দ করলেন। মাইনে বাড়ল তবু আটার ব্যবস্থা আগের মতোই রয়ে গেল। দিনে দিনে তাঁর যে মূর্তিটি বড় হয়ে উঠেছিল সে তাঁর জননী মূর্তি।

শান্তিনিকেতনে আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। কবি তাই বোধহয় লিখে ছিলেন তাঁর কথা মনে করেই।

''যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।''

''সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী'' সেখানে হয়ে উঠলেন অন্নপূর্ণা। মৃণালিনী রূপসী ছিলেন না, কিন্তু অপরূপ মাতৃস্নেহের আভা তাঁর মুখে লাবণ্যের মতো ঢলঢল করত। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়, এই ছিল প্রত্যক্ষদর্শীর অভিমত। পাঁচটি সন্তানের জননী মৃণালিনীর এই মাতৃমূর্তি আরো সার্থক হয়ে উঠেছিল—শান্তিনিকেতনে ঘর থেকে দূরে আসা শিশুগুলিকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক কিংবা অভিনয়ে যোগ দেবার আগ্রহও মৃণালিনীর ছিল না, একথা স্বীকার করতেই হবে। 'সখিসমিতির' দু-একটি অভিনয়ে কিংবা 'মায়ার খেলা'র ছোটখাট চরিত্রাভিনয়ে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কিছুতেই তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি। আসলে-গান-অভিনয়-সাহিত্যচর্চার মধ্যে মৃণালিনীর প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ তিনি ছিলেন এক শাশ্বতী নারী।

সাহিত্য বা শিল্পচর্চার নজির না থাকলেও নানারকম মেয়েলি গুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।

৪

মৃণালিনী আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আরো সার্থক হতে পারত। তিনি ব্রহ্মচর্য আশ্রমের দেখাশোনা করতেন। অপরের কচিকচি শিশুদের অপরিসীম মাতৃস্নেহে নিজের কাছে টেনে নিয়ে, তাদের হোস্টেলে আসার দুঃখ ভুলিয়ে দিতেন। বাড়ির থেকে দূরে এসেও ছেলেরা, মাতৃস্নেহের আশ্রয় পেত।

কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের তীব্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে, আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের মাত্র এগারো মাস পরেই ১৯০২ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন মৃণালিনী। মৃত্যু অবধারিত জেনে আমেরিকা থেকে মেজো জামাইকে ডেকে এনে রেনুকার বিয়ে সম্পন্ন করেন। রেনুকার বয়স তখন ১২ বছর। রথীন্দ্রের ১৪, মীরার ১০, শমীন্দ্রের ৮। বড় মেয়ে মাধুরীলতা তখন স্বামীগৃহে। কবির সমস্ত সেবা যত্ন ব্যর্থ করে দিয়ে শীতের পদ্মটি ম্লান হয়ে এল। হারিয়ে গেল কবির প্রিয় ''ছুটি''। কে জানত এত শীঘ্র জীবন থেকে, সংসার থেকে ছুটি নিয়ে তিনি চলে যাবেন।

জীবনের প্রতি পদে লোকান্তরিতা মৃণালিনীর অভাব অনুভব করেছেন রবীন্দ্রনাথ—''এমন কেউ নেই যাকে সব বলা যায়।'' কবি তাই লিখে ফেললেন বোধহয়।

''সে কি কেবলই চোখের জল? সে কি কেবলই দুখের শ্বাস?''

'স্মরণের' কবিতায় ঝরে পড়েছে লোকান্তরিতা পত্নীর জন্য বেদনা। অনুভব করেছেন তাঁর আশ্রম-ক্রিয়াকর্ম অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, কারণ ''আমি ওদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না।''

তাঁর দরদী আর আন্তরিকতার কথাই বা ভুলি কেমনে?

'ভগ্ন হৃদয়' পর্বে কবি বোধহয় তাঁর উদ্দেশ্যেই লিখেছিলেন।

'কত দিন একসাথে ছিনু ঘুমঘোরে,
তবু জানিতাম নাকো ভালোবাসি তোরে'।

ঘাটতি পুলিশে, সচিবকে তলব সুপ্রিম কোর্টের

ঠেকা দিয়ে আর চলছে না।

তদন্তকারী অফিসারের অভাবে থানাগুলিতে মামলার পাহাড় জমছে। মহিলা থানা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায়নি। কেননা মহিলা পুলিশ অপ্রতুল। অনুমোদিত পদের তুলনায় কনস্টেবলের সংখ্যা এতই কম যে, নিত্যদিনের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে পুলিশকর্তাদের। এই অবস্থায় পুলিশকর্মীর সংখ্যা না-বাড়িয়ে কয়েক বছর ধরে শুধু 'সিভিক পুলিশ' নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার।

কিন্তু তাতে সমস্যা আদৌ কমেনি। সিভিক পুলিশকর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় পুলিশি পরিষেবায় ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে বলে স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্তাদের একাংশের অভিমত। এই পরিস্থিতিতে স্বরাষ্ট্র দফতরের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের একটি নির্দেশ।

কী বলেছে সুপ্রিম কোর্ট?

পুলিশকর্মী কেন কম, সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। কেন শূন্য পদ পূরণ হচ্ছে না, তা জানতে চেয়ে আগামী শুক্রবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জে এস খেহরের এজলাসে। হাজির থাকতে বলা হয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রসচিবদেরও। পশ্চিমবঙ্গের মতো ওই সব রাজ্যেও অনুমোদিত পদের তুলনায় পুলিশের সংখ্যা অনেক কম।

বাংলার অবস্থাটা ঠিক কেমন?

''রাজ্যে এই মুহূর্তে পুলিশের ঘাটতি ঠিক কত, তার চূড়ান্ত হিসেব চলছে। তবে গত পাঁচ বছরে দেড় লক্ষের বেশি সিভিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে,'' বলেন এক পুলিশকর্তা। সিভিক পুলিশ দিয়ে সমস্যা মিটছে কি? সিভিক পুলিশকর্মীরা থানার রোজকার কাজে সহায়তা করছেন। রাস্তায় নেমে যান শাসন করছেন। এমনকী কোথাও গোলমাল হলে পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটেও যাচ্ছেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় তাঁদের যে পুরদস্তুর কাজে লাগানো যাচ্ছে না, সেটা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন পুলিশকর্তারাও।

রাজ্য প্রশাসনের একাংশ বলছেন, সিভিক পুলিশ নিয়োগ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হবে না। কেননা সিভিক পুলিশ অপরাধী ধরতে পারবে না, তদন্তে সাহায্য করতে পারবে না এমনকী থানায় প্রতিদিনের কাগজ-কলমের কাজও করতে পারবে না। স্বরাষ্ট্র দফতরের এক কর্তা বলেন, ''অপরাধী যাতে শাস্তি পায়, তার জমি তৈরি করাই পুলিশের মূল কাজ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ করতে পারলে তবেই সাধারণ মানুষ পুলিশের সদর্থক ভূমিকার প্রমাণ পাবেন। কিন্তু সেই কাজটা ঠিকঠাক করার মতো যথেষ্ট লোকবলই নেই রাজ্যের পুলিশবাহিনীতে।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা
(১৯/৪/১৭)

গুলি, বোমায় অশান্ত পাড়ুই

পাড়ুই কেউ বলছেন এলাকা দখল। কেউ বলছেন প্রতিরোধ। যাই-ই হোক রাজনৈতিক সংঘাতে অশান্ত পাড়ুই।

এলাকা দখলে বিজেপি-তৃণমূলে বোমাগুলির লড়াইয়ে সোমবার তেতে উঠে পাড়ুই থানার চৌমণ্ডলপুর গ্রাম। ঘটনায় তিন জন আহত হয়ে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। যাঁরা আহত হয়েছেন তাঁরা সকলেই তৃণমূলের কর্মী বলে দাবি করেছেন। অশান্তি থামাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে। লিখিত অভিযোগ, সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ এলাকা দখলের লক্ষ্যে আক্রমণ করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সোমবার রাতে চৌমণ্ডলপুরে দলের একটি বৈঠক চলছিল। রাত সাড়ে নটা নাগাদ সশস্ত্র লোক ঢুকে পড়ে অতর্কিত আক্রমণ করে। ইট ছুড়তে থাকে তারা। চলে বোমাবাজি। দেশি বন্দুক থেকে গুলিও শুরু হয়। অন্ধকারে বোমার ঝলকানি দেখে পড়শি গ্রামেও হল্লা শুরু হয়। আকস্মিকতা কাটিয়ে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কারও কারও গায়ে বোমার স্প্লিন্টার, ইটের টুকরো লাগতে থাকে। আধঘণ্টা পরে গ্রামের বাইরে ক্যাম্প থেকে পুলিশ আসে। কাছের থানাগুলি থেকেও পুলিশ বাহিনী এসে পড়ে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা আহত শেখ আহাদির আলম, শেখ হাবিবুল এবং আজিজুলদের দাবি, সোমবার তৃণমূলের বৈঠক চলছিল গ্রামে। তখনই চৌমণ্ডলপুর, মাখড়া, কোপাই-সহ হাতরবাদি থেকে বেশ কিছু দুষ্কৃতী এসে আক্রমণ করে। এক ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চলে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাধারণ বাসিন্দাদের অবশ্য দাবি, সংঘর্ষ মোটেই একতরফা নয়। দু'পক্ষই পরস্পরকে লক্ষ্য করে বোমা-গুলি ছুঁড়েছে। গ্রামের বিভিন্ন কোণে এক, পিছনের মাঠেদাপায় বেড়িয়েছে দুষ্কৃতীরা। এ দিন সকালেও পরিস্থিতি বেশ থমথমে ছিল বোঝমতাই কেন অশান্তি পাড়ুই ফিরল পাড়ুইয়ে?

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকে ইলামবাজার ব্লকের পাড়ুই থানা এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম বিজেপির ঘাঁটি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এলাকাবাসীর দাবি, ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে সংঘাতের জেরে তৃণমূলের বেশ কিছু লোকজন বিজেপির হয়ে ময়দানে আসে। সেই সময় গ্রাম দখলকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল দু'পক্ষের লড়াই লেগেই থাকত। বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনা ঘটে। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ তুলেছে। রাজনৈতিক চাপানউতোরে কার্যত উন্নয়ন থমকে গিয়েছিল। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে। যাঁদের নেতৃত্বে বিজেপি এলাকায় মাথা তুলেছিল, তাঁদের অনেকেই ফের তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় এলাকা ফের শান্ত হতে শুরু করে।

ফের পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির সাফল্যের পরে। ফের নতুন করে কোমর বাঁধা শুরু হয়েছে। এলাকাবাসীর একটা অংশ বিজেপিতেই থেকে গিয়েছিল বলে দাবি বিজেপি-র। গত দশ তারিখ এলাকায় বিজয় মিছিল করে বিজেপি। তারপর থেকেই উত্তপ্ত হতে শুরু করে এলাকা। দিন চারেক আগে আগে হাঁসড়া গ্রামে ও মাখড়া গ্রামে ব্যাপক বোমাবাজি হয়। দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিল। উত্তেজনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কিন্তু উত্তেজনার পারদ চড়ছেই। সোমবার রাতের ঘটনা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

জেলা পরিষদের তৃণমূল কর্মাধ্যক্ষ ইলামবাজার ব্লক সভাপতি জাফরুল ইসলাম বলেন, ''যেভাবে ২০১৪ সালে বিজেপি এলাকা দখলের চেষ্টা করে মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেছিল ফের সেই চেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি।'' বিজেপি-র জেলা সম্পাদক শ্রীমন্ত সিংহ বলেন, ''ভিত্তিহীন অভিযোগ। গ্রামে আমাদের লোকেরাই আক্রান্ত। সোমবার রাতে গ্রামে আক্রমণ করে শাসকদলের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। গ্রামের মানুষ তা প্রতিহত করে. তাতে দু'এক জনের সামান্য লেগে থাকতে পারে।''

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯/৪/১৭)

শিশু বনাম রবীন্দ্রনাথ

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

মাস বৈশাখ। সদ্য লীলা মজুমদারের 'পাকদণ্ডী' শেষ করেছি। মে মাসে লেখা চিঠিতে একবারও রবীন্দ্রনাথের কথা থাকবে না—এ হয় না। পরশু ভোররাতে দাড়িওলা ভারী সুপুরুষ একজনকে স্বপ্ন দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের হওয়া অসম্ভব নয়। অবশ্য স্বপ্নের চাররকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথম শনিবারে নিউইয়র্কে গিয়ে বেদান্ত সেন্টারের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান দেখলাম। বিবেকানন্দের জীবন নিয়ে চার অঙ্কের নাটক হল। দুই অঙ্ক জুড়ে দক্ষিণেশ্বরের দৃশ্য। যে ছেলেটি শ্রীরামকৃষ্ণ সেজেছিল, তাকে নকল দড়িতে খুব মানিয়েছিল। বার বার স্পট লাইটে তার মুখ দেখিয়েছে। আমেরিকায় বড় হওয়া গুজরাতি ছেলের অভিনয় দেখে বেদান্ত সেন্টারের স্বামীজিরাই মুগ্ধ। আমরা তো 'একেবারে ছোট গুরুদাস' বলতে বলতে বাড়ি এলাম। তা সেই দাড়িওলা মুখ স্বপ্নে দেখতেও পারি। দ্বিতীয়ত 'পাকদণ্ডী' পরিক্রমা হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের দাড়িওলা ছবির সঙ্গে সত্যজিতের আদল আছে কি নেই—এমন গবেষণায় ছবিটি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করেছি। সব মিলিয়ে ভোরের স্বপ্নে দাড়িওলা মহাপুরুষ ও মনীষীদের সমাহার হয়ে থাকবে।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সময় হল। ৮ মে রবিবার পড়েছিল। যাকে বলে দিনক্ষণ দেখে উৎসব করার কথা। কিন্তু দুটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিবাহ এবং মাতৃত্ব। না, একদিনে এমন কাণ্ড হয় না। বিবাহ হল আমাদের পরিচিত একটি ছেলের। সারা নিউ-জার্সির শ'আড়াই লোক নেমন্তন্ন পেয়ে 'আকবর' রেস্তোরাঁয় যাচ্ছি। আর মাতৃত্ব হল অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওই দিন মাদার্স ডে। ক্যালেন্ডারে যেমন যেমন লিখবে, তেমন তেমন হবে। ছেলে-মেয়েরা বিয়ে বাড়িতে মাকে পেয়ে যাবে বলে ওই দিনের মতো আমেরিকান রেস্তোরাঁয় গিয়ে মাদার্স ডে সেলিব্রেশন মুলতবি রেখেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শাজাহানকে করায়ত্ত করলেও আকবরের সঙ্গে পেরে ওঠেননি। আচ্ছা, দুপুরে রবীন্দ্র জয়ন্তী আর সন্ধ্যায় বিয়ে বাড়ি হতে পারত না? অসম্ভব? একদিনে এত উচ্ছ্বাস সামাল দেওয়া যায় না। কটকটে রোদে ককটেল পার্টির জন্যে আগাম সাজগোজ করে বেরনো যায়? তসর, মুগা থেকে ঝট করে তাঞ্চোই, জামেয়ারে শিফট করো, জুতো বদলাও, ব্যাগ বদলাও—ঝঞ্ঝাট অনেক।

তাই আমরা ১৪ মে রবীন্দ্রনাথের দিন ফেলেছিলাম, যারা বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন পায়নি, তাদের মধ্যে ছোট্ট একটা দল ৮ তারিখে 'কবি বন্দনা' করেছে। বাদবাকিরা, মানে নিউ ইয়র্কে কোথাও কোথাও ওইদিন হয়েছে। আর যে সব ক্লাবে মায়ের দাবি অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত, তারা 'মাদার্স ডে' দিনটি বাদ দিয়ে পরের উইক এন্ডই প্রশস্ত মনে করেছে।

এবার আমাদের খবর বলি। রবীন্দ্র জয়ন্তীর শুরু সেই ক্লাব প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই। ষোলো, সতেরো বছর ধরে কখনও চার্চের হলে, কখনও ইউনিভার্সিটির হলে অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। দু'বার সুচিত্রা মিত্র, একবার বনানী ঘোষ ও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন গান গেয়েছেন। এছাড়া স্থানীয় অনুষ্ঠান বলতে নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাটকের অংশ বিশেষ অভিনয়, শ্রুতি নাটক, গীতি আলেখ্য, রবীন্দ্র সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, আবৃত্তি ইত্যাদি যেমন সচরাচর হয় আর কি! হ্যাঁ, দেশের শিল্পী অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও গত রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ভালো গান গেয়ে গেছেন।

শিশুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক যে কত মধুর ছিল, সে কথা তো তাঁর আজীবনের সাহিত্য কর্মেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আমার লেখার নামকরণে সে কথা প্রকাশ পাচ্ছে কি? 'বনাম' আবার কী কথা? শিশু ভোলানাথদের সঙ্গে রবি ঠাকুর কি যুদ্ধে নেমেছেন? না ক্রিকেট খেলেছেন? এরকম কষ্টকল্পনা করা উচিতও নয়। সব কথা খোলসা করে বলি আগে, তবেই নামকরণের কারণ অনুধাবন করতে পারবেন।

ক্লাবের গোড়াপত্তনের পর বরাবরই দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিভার স্ফুরণের দিকে কড়া নজর দেওয়া হত। যদিও তখন সদস্য ছিল সর্বসাকুল্যে ছাব্বিশজন। ছোট ছেলে-মেয়ের সংখ্যাও হাতে গোনা। কিন্তু

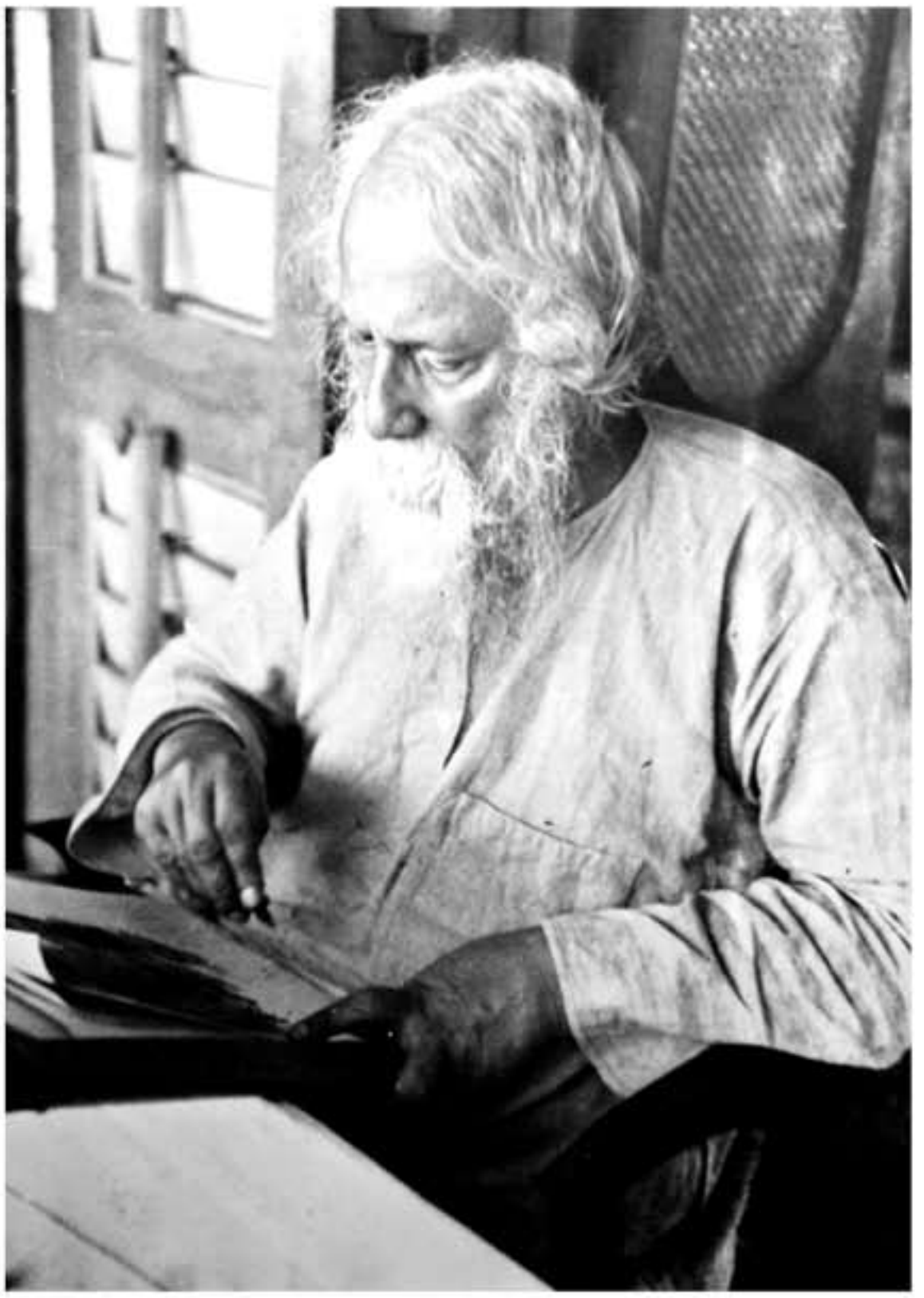

রবীন্দ্রনাথকে তাদের চেনা দরকার। ক্লাব থেকে একটা ঢালাও চিঠি দেওয়া হত। যাঁরা ছোটদের প্রতিভা বিকাশে আগ্রহী, তাঁরা যেন অমুক তারিখে রবীন্দ্র জয়ন্তীর রিহার্সালে সসন্তানে উপস্থিত থাকেন। গুট গুট করে যে কটি বাচ্চা আসত, কি পাঁচ-সাত জন টিন-এজার, তাদের অপূর্ব অনুবাদ সহযোগে, নাচ, গান শিখিয়ে বেশ সুন্দর অনুষ্ঠান করানো হত। মনে আছে, সচিত্র শিক্ষাও দিয়েছি। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন প্রথম পর্বে তারা নেচে, গেছে, হাততালি পেয়ে স্টেজ ছেড়ে দেওয়ার পর, বাবা-মায়েদের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত পটুত্বের যথেচ্ছ প্রকাশ। সবশেষে কচুরি, আলুর দম আর বাড়ির তৈরি পান্তুয়া। তারপর স্টেজ পরিষ্কার, রবীন্দ্রনাথের ছবি চাদর দিয়ে মোড়া, হারমোনিয়াম, তবলা ফেরত দেওয়া, ধূপের ভস্মাবশেষ নিশ্চিহ্ন করা, সাদা চাদর, লাল কার্পেট গুটিয়ে পাশ বালিশের স্টাইলে তুলে দেওয়া, উতবুত্ত পান্তুয়া ভাগাভাগি। পেল্লায় ট্রে ভর্তি খয়েরি রস লুকিয়ে লুকিয়ে চার্চের রান্নাঘরের সিংকে ঢালার ফলে বনস্পতি জমে গিয়ে রসের বানভাসি, প্রবল বেগে গরম জল চালিয়ে দিয়ে হাতা সহযোগে পাইপের মুখে আন্দোলন সৃষ্টি, বিদায় বেলায় হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া ফুলদানি যুগল থেকে পরস্পরকে ফুল বিতরণ।—এই ছিল বার্ষিক অনুষ্ঠান। কদম ছাঁট দেওয়া গোলগাল ছেলেগুলো আমাদের হাতে আঁকা চোখ, ভুরু, গোঁপ, লিপস্টিক মুছে ফেলে দৌড় দিত। ঝুঁটি বাঁধা মেয়েগুলো আইশ্যাডো মুছতে দিত না। একবার কার যেন ছোট্ট মেয়ে আনমনে গান ধরেছিল—পেমের যোগাড়ে ভাসাবো ডোয়ারে...।

মাঝে অনেক বছর চলে গেছে। যথাকালে তার প্রেমের জোগাড় হয়ে বিয়েও হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তদ্ভব বাণী নিয়ে অত আশ্চর্য হবার কিছু নেই। দেশে এক নাচের মাস্টারমশাই 'শ্যামার' রিহার্সালে বজ্রসেনকে 'জেনো প্রেম চিরঋণী' নাচটি শেখাতে গিয়ে 'কালিমার' পরশের সময় দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে মাকালীকে স্মরণ করেছিলেন। আর এরা তো শিশু! আহা! আরও তদ্ভব শব্দ শুনেছি। একবার বঙ্গ সম্মেলনের সময় শিশুদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আর আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। পরীক্ষা চলার মধ্যেই উদ্যোক্তারা দূর থেকে আসা বিচারকদের চা আর স্ন্যাকসের প্লেট ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। স্বকর্ণে শুনেছিলাম বছরপাঁচেকের একটা মেয়ে 'সোনার হরিণ চাই' গাইতে বসে অন্তরায় বড় উদাস সুরে বলেছিল—'তোরা খাবার জিনিস হাতে কিনিস। রাকিস ঘরে ভরে...' আমরা জলখাবার নিয়ে অপ্রস্তুত। পরে আবার অন্য এক বিচারক বললেন, তিনি নাকি শুনেছেন মেয়েটা গাইছিল, 'তোরা বাবার জিনিস হাতে কিনিস।' শিশুদের কী সংযম! বিচারকদের বলছে, হয় তোরা নিজে হাতে কিনে খা, নয় বাবার জন্যে কিনে আন্। তদ্ভব বাণীর এই ভাবেই উদ্ভব হয়।

হ্যাঁ, আবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে যাই। ওই যে বছর বছর ছোটদের নিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। ক্রমাগতই তার জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগল। পপুলারিটি মানেই পপুলেশন বৃদ্ধি। সদস্য সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। ব্যাচেলাররা বিয়ে করে সংসার বড় করছে। যারা নববিবাহিত ছিল, তাদের ছেলে-মেয়ে হতে আরম্ভ করেছে। কারও একটি থেকে দুটি। মোটমাট অবস্থা এমন দাঁড়াল যে রবীন্দ্রজয়ন্তীতে ওদের নিয়ে ঘণ্টাখানেক নৃত্যনাট্য না করলে সবাইকে স্টেজে তোলা যায় না। আমরা তিন ডলার করে টিকিট করে দিলাম। তাতেও উৎসাহী বাবা-মায়ের আপত্তি নেই। দখিন দুয়ার খোলাতে জগাই মাধাইরা এসো হে এসো হে করে গোঁপ নাচিয়ে হাসছে। কচি কচি কণ্ঠের আবৃত্তি, গান, বেশ লাগছে সকলের।

কিন্তু বেশিদিন এ ধারা বজায় রাখা গেল না। একটু বড় হলে ছেলেরা মোটেই নাচতে, গাইতে রাজি হয় না। মেরে ধরে তো আর রবীন্দ্রচর্চা হয় না। 'তোতাকাহিনী'-র পাঠকরা পাখির ছানার গলায় বাংলা কালচার ঠুসে দেওয়া পছন্দ করে না। ভেবেচিন্তে অন্য উপায় স্থির হল। ইচ্ছুক ছেলে-মেয়েরা সবাই বড়দের শেখানো রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য বা গীতিনাট্যে অংশ নেবে। বাকিরা পাঁচ মিনিট করে সময় পাবে। যে যা কিছু অন্যত্র শিখেছে, তাই করে দেখাবে। ট্যালেন্ট শো আর রবীন্দ্রজয়ন্তী একদিনে।

বিচিত্রানুষ্ঠান কাকে বলে দেখলাম। শিব্রাম চক্রবর্তীর 'আবার হাঁসের ডাক' কিংবা হারমোনিয়ামের কালোর রিডগুলো বাজাতে জানার বিশেষ ক্ষমতা সহযোগে 'আকাশে চাঁদ ছিল রে' গানের জলসার মতো বৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি। দুপুর বারোটার মধ্যে নির্ধারিত শিল্পীরা এসে উপস্থিত। আমরা নেহরু দিবসের স্টাইলে রবীন্দ্রনাথের শিশুপ্রীতির ওপর আবেগমথিত ভূমিকা নিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ করে দিতাম। খেরোখাতা খুলে মাইকে নাম ডাকা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর মঞ্চে আবির্ভাব। যন্ত্রপাতি নিয়ে বাবা-মা ঝড়ের বেগে পৌঁছে যাচ্ছেন। নয়তো পাঁচ মিনিটের থেকে এক মিনিট নষ্ট হয়ে যাবে। সময়েরব্যাপারে নির্মম হওয়া ছাড়া আমাদের উপায় নেই। তারপর কয়েক ঘণ্টা ধরে স্বতঃস্ফূর্ত নিনাদ। কেউ ট্রামপেট বাজাচ্ছে, কেউ সাকসোফোন, কেউ সিন্থেসাইজার, কেউ টুই টুই করে হাওয়াইয়ান গিটারের সঙ্গে গাইছে। একদল জোর মহড়া দিয়ে ব্যান্ড তৈরি করেছে। দমাদ্দম ড্রামের সঙ্গে সোমের মাথায় ঝাঁই করে কাঁসরে লাঠির বাড়ি। তাদের লিড সিঙ্গার দুর্দান্ত রক মিউজিক গাইছে। মাইকের তার টানতে টানতে স্টেজের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো সতত সঞ্চরমান। অথচ এই ছেলেটাকে গত বছর 'আমার মা না হয়ে তুমি আর কারো মা হলে' আবৃত্তি শেখাতে গিয়ে তার মা নাস্তানুবুদ। যাইহোক, বিচিত্রানুষ্ঠানে মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি। যারা নৃত্যনাট্যে ঢুকে পড়েছিল তারা ছাড়া অন্যেরা ট্যাপ ডান্স, ব্যালে, বেহালা, বাঁশি, পিয়ানো—সুরের সুরধুনি বইতে দিল। কেউ নিজের লেখা কবিতা, ইংরেজি গল্প, চুটকি পড়ে শোনাচ্ছে। সদস্যদের আত্মীয়স্বজনের ছেলেমেয়েরা অন্য স্টেট থেকে এসে ট্যালেন্ট শো করে যাচ্ছে। আমরা ঝপাঝপ কড়ি ডলারের রসিদ কেটে তাদের ক্লাবে ঢুকিয়ে নিচ্ছি। একদিনে লক্ষ্মী সরস্বতীর আরাধনা। অনুষ্ঠান সূচির দৈর্ঘ্য বাড়তে বাড়তে এমন দাঁড়াল যে বড়দের গীতিলেখ্য ছাঁটাই করলেই সময়ে কুলোনো যায়। দিকে দিকে ক্লাবের জয়গান। ছোটদের জন্য এমন 'জয়' (Joy) ও গানের বন্দোবস্ত কোথাও নেই। আবার দুর্গাপুজোতেও তাদের নিয়ে বড় করে অনুষ্ঠান হয়। বছরে দু-বার প্রতিভার বিচ্ছুরণ।

কিন্তু একটানা কোনও ধারা বেশিদিন বজায় থাকেনি। ব্রেকডান্সের মহিমাও ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। দেখা গেল ট্যালেন্ট শোর শতকরা আশিভাগেই ভারতীয় গান বাজনায় দাঁড়িয়েছে। প্রথমত আমাদের দুই গুণী সদস্য—বিজয়লক্ষ্মী ব্যানার্জি আর পূরবী হোড় নিজেরা ভাল গান করেন। তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে সম্মেলক সঙ্গীতানুষ্ঠানের সূচনা করলেন। বড়দের নিজে বিজয়লক্ষ্মী আগেই সঙ্গীত পরিচালনা করতেন।

এরপর ২০ পাতায়

শিশু বনাম রবীন্দ্রনাথ

১৯ পাতার পর

এবার স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে চমৎকার সব রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। ট্যালেন্ট শো-য়ে বিজয়লক্ষ্মী আর পূর্ণিমার ছাত্রীরা একক ও সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে অন্যদের মধ্যেও উদ্দীপনার সঞ্চার করল। বেহালায়, বাঁশিতে, ক্ল্যারিওনেট, সিনথেসাইজারে দুটি দুটি করে বাংলা গানের সুর ছেলে-মেয়েরাই বাজাতে শিখল আমাদের বিশেষ গুণী সদস্য অরুণ ভৌমিক একাধারে গান, তবলা, বেহালায় পারদর্শী। তাঁর শিক্ষায় কটি ছেলে-মেয়ে বছরের পর বছর চমৎকার অনুষ্ঠান করছে। স্বপ্না দত্ত আর এক শিক্ষিকা। তাঁর ছাত্রছাত্রীরা (বাঙালি অবাঙালি মিশিয়ে) বাংলা গানের দলে যোগ দেয়। এছাড়া আমাদের ক্লাবের বাইরে বিভিন্ন গান বাজনার স্কুল হয়েছে। বনানী ঘোষেরও গানের স্কুল ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে হামিদ হোসেন বলে একজন সঙ্গীত শিক্ষক মাসে মাসে নিউ জার্সিতে গান, তবলা ও সেতার শেখাতে আসেন। বাবা-মায়ের আগ্রহে বেশ কিছু ছোট ছেলেমেয়ে ওই সব ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। ক্লাবের ট্যালেন্ট শো-তে তাই ভজন, গীতি, ঠুমরি, রাগপ্রধান গান, সেতার, তবলা লহরা শোনাবার সুযোগ পেল। কবিতা বলার প্রবণতাও ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সময় নিয়েই মহা সমস্যা। কাউকে না বলা চলবে না। কারণ সংবিধান অনুযায়ী ক্লাব ছোটদের সংস্কৃতি উন্মেষের ওপর ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে রেখেছে। বাধ্য হয়ে নতুন কাস্টিং-এর চেষ্টা যে কেন করা হয়নি, তা নয়। মাথা পিছু এক মিনিট কমিয়ে দিতে গানের দল যদিবা মেনে নিল, সেতারের শিশু শিল্পী মা-বাবার প্রবল উৎকণ্ঠা। চার মিনিটে আলাপ, প্রলাপ, ঝালা, মীড় বাজানো যায়? তখন সেতারে কনসেশন দিতে হল। তবলা লহরার শিল্পীদের অন্যদিকে ভিড়িয়ে দিতে গিয়ে মহা অবিচার করছিলাম। তাদের অন্যদের গানের সঙ্গে শুধু সঙ্গত করতে বলাতে মায়েরা খুব ব্যথিত হলেন। আমরা যুক্তি দিয়েছিলাম, 'রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে তো। ওরা মেয়েদের গানের সঙ্গে বারবার দাদরা, কাহারবা বাজিয়ে দিক। চাই কি বাঁশওয়ালারও স্কোপ আছে। অন্যদের গানের সঙ্গেও একতাল, তিনতাল কত রকম ঠেকা দিতে পারবে। তবলায় স্টেজে উঠতে পারবে...।' এই সব কনসোলেশন প্রাইজ তারা নেবে কেন? বরং তবলা লহরার জন্যে বরাদ্দ চার মিনিটেই তাদের যথেষ্ট। অতএব পঞ্চাশজন শিশু বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী নিয়ে ছ-সাত সপ্তাহ ধরে রবীন্দ্রজয়ন্তী চলতে লাগল। নতুন দুটো নাচের স্কুলের দৌলতে গণেশ বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, কুচিপুড়ি, মোহিনী আট্টম, গরবা, গীত গোবিন্দ, মণিপুরী, ছৌনৃত্য, মহিষাসুর বধ, আধখানা চণ্ডালিকা, সিকিভাগ চিত্রাঙ্গদা, সংকুচিত ভানুসিংহ, কবিতার সঙ্গে নাচ, নাচের সঙ্গে বাদ্যবৃন্দ—গোটা ভারতবর্ষের হাওয়া অকস্মাৎ আমাদের রবীন্দ্র উদযাপিত হতে লাগল। বড়দের গান বাজনা তাদের মহিমায় ততদিনে নেহাত নিয়ম রক্ষার্থে এসে ঠেকেছে। সে নিয়েও আক্ষেপ, সমালোচনা কানে আসে। রবীন্দ্র জয়ন্তীর নামে 'আন প্রফেশন্যাল' ব্যাপার স্যাপার নিয়ে টুকরো মন্তব্য। আমরা কান দিই না। দীর্ঘ অনুষ্ঠানে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই যথোচিত শিক্ষিত হয়ে নাচ, গান, আবৃত্তি, বাজনা, যা করার করছে। কম সম্মানে বছর বছর গিয়ে সারা আমেরিকার বাঙালি ছেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে। প্রথম, দ্বিতীয় হয়ে ক্লাবের মান মর্যাদা বাড়াচ্ছে। দু-চারজনের বাজে কথায় ক্লাবের ঐতিহ্য নষ্ট করা যায় না। মাঝে নিউ জার্সিতে দু'বার বনানী ঘোষের উদ্যোগে রবীন্দ্রমেলা হয়ে গেল। আমাদের ক্লাবের ছেলেমেয়েরাই তো ছিল প্রধান ভূমিকায়। নিউ ইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীতে ওরা 'বাল্মীকি প্রতিভা' করে এসেছিল অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত নিজে হাতে পুরস্কার দিয়েছিলেন। বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। একদিনে কি আর কিছু হয়? বাড়ির উৎসাহে আর ক্লাবের ব্যবস্থাপনার বীজ রোপণ হয়েছিল। রবীন্দ্র জয়ন্তীর বিচিত্রানুষ্ঠানে আমরা হাত দিই না। চেষ্টা করি ওই একটি দিন ছোটরা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে কিছু করুক। অন্তত যতজনকে উৎসাহিত করা যায় আর কি!

একদল স্কুল পেরিয়ে কলেজে চলে যাচ্ছে। অন্য দল নতুন করে ক্লাবে নাম লেখাচ্ছে। এখন আমাদের সদস্য সংখ্যা আড়াইশো। ছেলেমেয়ের সংখ্যাও সেই অনুপাতে বেড়েছে। 'ট্যালেন্ট শো' চলছে, চলবে বলেই মনে হয়। বছর দুই আগে ফোনে এক ভদ্রলোক যোগাযোগ করলেন। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তাঁর পাঁচ বছরের ছেলে কবিতা বলবে। নাম, ধাম টুকে নিলাম। বরাদ্দ চার মিনিট সময়ের কথাও বলে দিলাম। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন দেখা হল। রোগা, শ্যামলা বরণ ছেলে। চোখ দুটি ভাসা ভাসা। নাম—মহারাজ পাল। কবিতার নাম—রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। সর্বনাশ! মে মাসের দুপুরে চার মিনিট হাতে পেয়েছে। ধান কাটিতে কাটিতে তো বর্ষা পার হয়ে যাবে! মহারাজের বাবাকে বললাম—অত বড় কবিতা বেছে দিলেন! সময় তো অত দেওয়া মুশকিল।

অভয় দিয়ে তিনি বললেন—সবটা বলবে না। দেখুন না, এক্ষুনি ভুলে যাবে।

কী অপূর্ব আশ্বাস। আমরাও সেই ভরসায় ছোট্ট চোস্ত আর কারুকার্যকরা পাঞ্জাবি গায়ে 'মহারাজ'কে সভায় বসিয়ে দিলাম। সে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ভক্তিভরে নমস্কার করল। তারপর অস্ফুট স্বরে...'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা... নাহি ভরসা—' পর্যন্ত বলে কিয়ৎক্ষণ নীরবতা। আবার রবীন্দ্রনাথের ছবিকে নমস্কার এবং 'গগনে গরজে মেঘ...।' 'ভরসা'র পর তাঁর মৌনব্রত দেখে বাবা-'রাশি রাশি, ভারা, ভারা'—তখন মহারাজ—'ধান কাটা হোলো সারা' এবং সুদীর্ঘ নীরবতা। বাবার তাড়না, দর্শকদের নির্মল হাসি এবং সহযোগিতা। সে রবীন্দ্র জয়ন্তী ভুলব না। মহারাজের উতোর আর দর্শকদের চাপান। মহারাজ বলছে—'একখানি ছোটো খেত আমি একেলা।' বলেই দর্শকদের সুযোগ দিতে চুপ করে যাচ্ছে। তাঁরা সমস্বরে ক্যাচ লুফে নিয়ে—'চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।'...হঠাৎ মহারাজ আপন-মনে—'বাঁকা জল, বাঁকা জল করিছে খেলা।' বড় করতালি সহযোগে মহারাজ সিংহাসন থেকে নেমে এলেন। বাবা সগর্বে বললেন—বলেছিলাম না, সবটা বলবে না?

এ বছর ক্লাবের নতুন কমিটি তাঁদের পরিকল্পনা মতো রবীন্দ্র জয়ন্তীর ডাউনগ্রেড করেছেন। 'ট্যালেন্ট শো'-র শিল্পী সংখ্যা নাকি গত বছর থেকে একটু কমে গেছে। যারা নিয়মিত অংশ নিত, তাদের মধ্যে বেশ বড় একটি দল হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তাই এবার বড়দের গান বাজনার সময় পাওয়া গেল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভার নিয়েছিলেন যিনি, তিনি নিজেও সুগায়িকা। দেশে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড করে এসেছেন। সুপর্ণা গুহর নাম শুনেছেন কি? গীতবিতানের ছাত্রী ছিলেন। শান্তিনিকেতনেরও বটে। দেশে থাকতে সুপর্ণা লাহিড়ি নামে রেডিয়োতে গেয়েছেন। এখানে ওঁর 'সঙ্গীত সংসদ' নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নৃত্যশিক্ষার স্কুল আছে। সেমিক্লাসিক্যাল সঙ্গীতও শেখানো হয়। বহু বছর ধরে সুপর্ণাদির প্রযোজনায় ও পরিচালনায় যে সব রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য হয়ে আসছে, তাতে স্থানীয় শিল্পীরা ছাড়াও দেশ থেকে বাণী ঠাকুর, ঋতু গুহ, রমা মণ্ডল নৃত্যশিল্পী অমিত চ্যাটার্জি, গায়ত্রী চ্যাটার্জি, অলকানন্দা রায় প্রমুখ আরও অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে এসে যোগ দিয়েছেন।

সুপর্ণাদি ক্লাবের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এ বছর বড়দের গীতি আলেখ্য পরিচালনা করলেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে যে কোরাস হবে, সেটি প্রথমে ঠিক হয়েছিল—এই তো ভালো লেগেছিল। সুপর্ণাদি কলেজে আমাদের সিনিয়র। পারিবারিক সূত্রেও বহুদিন পরিচয়। তাই 'রবীন্দ্র জয়ন্তীর' কোরাস বাহিনীতে সামিল হব না বলার সাহস পাইনি। ফোনে বললেন—কেমন গানটা বেছেছি বল তো? আন্দাজ কর! তুই-ই বলতে পারলি না! কী রে?

সোৎসাহে উত্তর দিলাম—ওই যে। আমার নাম আছে বলে! আলোর নাচন পাতায় পাতায়।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? শোন, আসলে ছোটদের জন্যে পুরো ফাংশনটা ডেডিকেট করে দিচ্ছি। রবীন্দ্র জয়ন্তীতে ওরাই আসল। লাইনটা বুঝতে পেরেছিস? 'ছোট্ট মেয়ে ধুলায় বসে, খেলার সাজি একলা সাজায়...।'

নিশ্চিন্ত হয়ে বলি—জানা গানই ভাল সুপর্ণাদি। সকলের তো রিহার্সালের সময়ও নেই।

—আরে শোন! সাংঘাতিক ভালো একটা কবিতা বলবি। মানে, মানে কী বলব? এমন একটা কবিতা! তুই তো জানিস...।

আমি কিছুই জানি না সুপর্ণাদি। রবীন্দ্রনাথের সাংঘাতিক ভালো কবিতার সংখ্যা যে অসংখ্য। আমি কিবা বুঝি। আমি কেন খুঁজে মরি হে? তুমিই বলে দাও বরং। অবশ্য ফোনে এসব কিছু বলিনি। মনে মনে ভেবেছি, অবকাশে খুঁজে নেব।

আবার সুপর্ণাদির ফোন। ভাবলাম রিহার্সালে ডাকছেন বোধহয়। সুপর্ণাদির ফতোয়া—শোন। কোরাসের গান কেটে দিলাম।

—সে কী? ছোট মেয়ে ধুলায় বসে—হবে না? বললে যে ছোটদের জন্যেই রবীন্দ্রজয়ন্তীর ফাংশন ডেডিকেট করবে?

—সেই তো করছি! ও গানটা বেশিরভাগ লোক জানে না। এই লাস্ট মোমেন্টে কজনকে শেখাব বল?

—আহা! আমি রোজ নিজে মনে প্র্যাকটিস করছিলাম গো—লাগলো ভালো, মন ভোলালো...।

—জানি রে জানি। গানটা বড্ড ভালো! কিন্তু উপায় নেই। অর্ধেক লোক জানে না।

—তাহলে কোনটা ঠিক করলে?

—নব নব, নব নব, নব রূপের নবরূপা।

—কিন্তু সুপর্ণাদি, ওটা রেখো না। ইনফ্যান্ট ক্লাস থেকে নেচে আসছি...।

—ওটা অনেকে জানে যে! দেখবি কোরাস খুব ভালো হবে।

কোলাহলে থাকব ভেবে আর প্রতিবাদ করি না। কিন্তু তখনও সুপর্ণাদির কথা শেষ হয়নি—তোর কবিতাটাও ঠিক করে ফেললাম।

—কোনটা বলো তো?

—খেলা ভোলা। ছোটদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একেবারে সহজ ভাবে বলবি।

—সে কী? আমার যে 'কৃপণ' আবৃত্তি করার বড্ড ইচ্ছে ছিল।

—না, না খেলা ভোলা। খেলা ভোলা। মনে থাকবে তো? বাই।

ঠকাস করে যেন রাখার শব্দ। সুপর্ণাদি ট্যালেন্ট শো-র দিনে সংখ্যাগুরু দর্শক আর শিল্পীদের বয়স বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথের শিশু আর শিশু ভোলানাথের স্মরণ নিয়েছেন। ক্লাবের সংবিধানও তো সেই কথাই লিখে দিয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের সঙ্গে বাংলার ভাষা সংস্কৃতির পরিচয় ঘটাতে হবে। ওরা উপলব্ধি না করলে রবীন্দ্র জয়ন্তীর সার্থকতা কোথায়? অতএব রবীন্দ্রনাথের সাংঘাতিক ভালো ভালো কবিতা থেকে সহজবোধ্য কিছু বেছে নিতে হবে। কিন্তু মহারাজ পাল? বাল্যকালে তার ধান কাটা সারা হয়ে গেল। পাঁচ বছরের শিশু যদি আমাদের মনোরঞ্জনের আশায় তার বাবার বুদ্ধিতে ওই কবিতা বলে থাকে, তবে ওর কাছেই আমার শিক্ষা নেওয়া উচিত। বড়দের ইমপ্রেস করবে বলেই তো স্টেজে উঠেছিল? স্বর্ণ মুহূর্তগুলি ভুলিনি। তাহলে, আমাকেও কিছু ফিরিয়ে দিতে হবে। খোকাবাবুকে কবিতা প্রত্যার্পণের জন্যে আমার খুঁড়িয়ে প্রত্যাবর্তন! সুপর্ণাদির প্রেরণায় সহজভাবে গল্প করার মতো করে 'তুই কি ভাবিস দিন রাত্তির খেলতে আমার মন? কক্ষনো তা সত্যি না মা, আমার কথা শোন...' না। ক্লাস ফোরের কবিতা এ বয়সে মুখস্থ থাকে? মাঝখান থেকে মেয়েকে ছোটবেলায় জবরদস্তি শেখানো 'অন্য মা' কবিতাটা মনে পড়ে যাচ্ছে। সুপর্ণাদির কাছে অ্যাপিল করব? 'সন্ধেবেলা দিনে খেলে অন্তুতে আর মাতে'...আহা! রবির তুল্য শব্দ অবু নয়? হ্যাঁ, এই কবিতাই বলব। তার আগে সহজ করে একটু ভূমিকা দেব—আমরা যারা মাকে ছেড়ে অন্য পারে চলে এসেছি, মাকে অ্যাটলান্টিক ওপারে, আমাদের, যাদের মা-র জন্যে খুব মন কেমন করে, ইচ্ছে করলেও সন্ধে হলে নদী পার হয়ে মা-র কাছে যেতে পারি না, তাদের মাকে ভালোবাসার কবিতা। রবীন্দ্রনাথ মাকে ছেড়ে থাকার কষ্ট বুঝতেন। ছোট বয়সে ওঁর মা গিয়েছিলেন তো...।

২৮ মে ১৯৯৫

আশ্রমে কিচেন মহিমা

মেধা চট্টোপাধ্যায়

'কিচেন'—বানান দেখেই স্বাভাবিক ভাবেই আমার পাঠক পাঠিকাদের মনে জাগবে; শান্তিনিকেতনের মত এটাই উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটাই-ই উচ্চমানের উচ্চারণ বিভ্রাট। 'Kitchen' ইংরাজীতে ঠিক কিভাবে উচ্চারিত হয় তা সর্বজনবিদিত। প্রশ্ন হল এই বিভ্রাট ঘটল কেন? সঠিক উত্তর জানা নেই—তবে প্রচলিত শব্দ হিসাবে তো অনেক ইংরাজী শব্দই বাংলা অভিধানভুক্ত হয়ে পড়েছে—এই এ বেচারার অবস্থান ও বিভ্রাট ঘটিয়েছে প্রচলিত ভাবেই—পাঠক পাঠিকারা কি বলেন?

তবে আর ভনিতা না করে আসল কথাতেই আসা যাক। Kitchen-এর বাংলা অর্থ রান্নাঘরই বোঝায় তবে শান্তিনিকেতনের 'কিচেন' বলতে রান্নাঘর ও খাবার ঘর দুটোই বোঝায় কারণ সেখানে দুরকম কাজেরই ব্যবস্থাপনা আছে। ভূমিকা শুনেই বুয়া বলে উঠল—এই যে নিশ্চয় Subject matter এ ঘাটতি পড়েছে—তা না হলে অথবা কিচেন নিয়ে মাথা ঘামায় কেউ! বুয়ার উক্তি শুনে প্রথমে মনটা যে একটু দমে যায়নি তা নয়—সত্যিই তো, শান্তিনিকেতনের মত উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে কিচেনের গুরুত্ব কি বা থাকতে পারে—কিন্তু তৎক্ষণে মনে নানা ছবি উঁকি মারতে লাগল। কোন ছবিটা কোথায় কিভাবে সাজাব সেই ভাবনাই আমাকে বিচলিত করে তুলল। বুয়া ব্যাপারটায় একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছে না দেখে ওকে পরবর্তী রচনার Subject matter ভাবার গুরু দায়িত্বটি দিয়ে তখনকার মত বিদায় দিলাম।

মনের ছবিগুলো ছোট হলে কি হবে, সাজাবার দায়িত্ব আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। দশ বারো বছরের আশ্রমজীবন কিচেনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। সকাল সাতটা থেকে রাত নটার মধ্যে চারবার খেতে যাওয়া আসাতো দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত—এছাড়া যখন তখন অবারিত দ্বার কিচেনে ঢুকেই কখনও নুন লঙ্কার চাহিদা, তো কখনও খিদে পেয়েছে বলে গরম রুটি আর আকভাজি আলু পটল মুলো কপির বিশেষ এক আস্বাদ নেওয়া। সারা বছরের নিয়ম বাঁধা সময়ে কোন ব্যতিক্রম ছিল না বটে কিন্তু এই সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার মধ্যেও ছিল বেশ ঘটনাবহুল আনন্দ।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় কিচেনের দুটি ভাগ ছিল—রান্নাঘর ছিল দুটি আমিষ ও নিরামিষ দুই পর্যায়ে—সেই সঙ্গে খাবার ঘর ও ছিল দুটি আলাদা—একটি পাঠভবন (School) ও অপরটি বাকি অন্যান্য ভবনের যেমন শিক্ষাভবন (Collage), সঙ্গীতভবন, কলাভবন ইত্যাদি ভবনের জন্য। এছাড়া কিছু আশ্রমবাসী, শিক্ষক, অধ্যাপকরা নিজেদের প্রয়োজনে কখনও এসে খেতেন কখন ও লোক মারফত খাবার বাড়ী নিয়ে খেতে পারতেন। আশ্রম কর্মী ও শিক্ষকদের জন্য এ ব্যাপারে অতি সুব্যবস্থা ছিল। খাবারের দুটি ঘরেই নিরামিষাশীদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা পরিকাঠামো ছিল।

নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে ঘটনাবহুল আনন্দ ছবিগুলির মধ্যে আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়ে রান্নাঘরের অন্যতম কর্মচারি কালীপদদার একেবারে সহজ সরল গ্রাম্য অথচ অতি উচ্চমানের কার্যকলাপ ও মনোবৃত্তির কথা—যা আমাকে প্রতিপদে তুচ্ছ অথচ অতি উচ্চপর্যায়ের শিক্ষালাভে সাহায্য করে আমাকে বড় করে তুলেছিল—বিশেষ করে 'আমাকে' বলার কারণ হল আমি শৈশবে খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কিচেনের নিয়মশৃঙ্খলার কিছুক্ষেত্রে বিভ্রাট সৃষ্টিকারী হওয়ায় ঐ কালীপদদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেতে শিখিয়ে ছিল এবং খাবার নষ্ট করলে মানুষের কতখানি ক্ষতি করা হয় তা যেমন আমার বাবা মায়ের কাছে জেনেছিলাম তেমনই জেনেছিলাম সেই অতিসরল, উচ্চমানের গ্রাম্য মানুষটির কাছে কত সহজে আমার কাছে তার সেই শিক্ষার বিশেষ ভাষাটি আজও সুস্পষ্ট—''দিদিগো, তুমি খাবার নষ্ট করলে, তা ডাস্টবীনে গরীব মানুষ, কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে খায়''। এই উক্তি আমাকে চিরকালের জন্য খাবার নষ্ট করা থেকে বিরত করেছে। এরকম ছোটখাটো শিক্ষা আমরা ছাত্রছাত্রীরা তো পেয়েইছি তার কাছে-তার সহকর্মী বন্ধুরাও বাদ যায়নি এ ব্যাপারে। এসব কথা মনে পড়লে ভাবি কবিগুরু কি দেখে গুসকরা স্টেশনের বাড়ী ছাড়া কিশোরটিকে চিনেছিলেন কে জানে! আমার ভাবি কবির আশ্রম শিক্ষা সাগরে ডুব দিতে দিতে কয়লার টুকরো ধুয়ে মুছে হীরে হয়ে দেখা দিয়েছিল বোধ হয়।

কিচেনে প্রতি মাসের শেষে এক রাতে Feast-এর ব্যবস্থা ছিল। সেদিন রাতে আমীষ বিভাগে মাংস তো হতই এছাড়া রান্নার পদেও তারতম্য ও শেষ পাতে মিষ্টি তো থাকতই—নিরামিষ বিভাগ ও এ আনন্দে বঞ্চিত হত না তাদের মনের মত বিশেষ পদ ও শেষ পাতে মিষ্টি পরিবেশিত হত। খাওয়া শেষে দুটি ঘরের যে কোনটি থেকে উচ্ছ্বাসিত প্রশ্ন আসত—'লাগছে কেমন'? উত্তরে শোনা যেত—বেশ। তিনবার প্রশ্নোত্তর শেষে সকলে নিজেদের কাজ সেরে হস্টেলে ফিরত আনন্দে। 'কিচেন' এই আনন্দের সাক্ষী কতদিন ছিল জানি না। এখন 'কিচেন' নানা বিভাগে বিভক্ত। মনে হয়না এই বিশেষ আনন্দ মুহূর্ত কিচেনে আর ফিরে আসে। ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনায় ভরপুর ছিল আমাদের 'কিচেন'। কালবৈশাখী ঝড়ে পড়া ছোট ছোট আমের কৌটর ভর্তি করার আনন্দ টেনে নিয়ে যেত কিচেন অবধি। আবার তাল পাকলে সেগুলোও গাছতলা থেকে কুড়িয়ে একে একে জড়ো করতাম সেই গ্রাম্য সরল কালীপদদার কাছে। সে দায়িত্ব নিয়ে সময়োপযোগী আমের টক আবার তালের বড়া কিচেনে সদস্যদের পাতে দিতে মোটেই পিছপা ছিল না—বরং এতেই তার উৎসাহ বেশী কারণ তার স্নেহের দিদিমণিরা কষ্ট করে কুড়িয়ে এনে সব কিচেন সদস্যদের খাওয়াতে বলেছে।

এই সব আনন্দের মাঝেও কখন কখনও কিচেনের রান্নার কোয়ালিটি নিয়ে গোল বেধে যেত। এই যুদ্ধে দিদিমণিরাই ছোট বড় সকলকে উত্তেজিত করে প্রথমে কিচেন ম্যানেজারকে উত্যক্ত করে মারত—তেমন ফল না পেলে ছুটত সোজা উপাচার্যের অফিসে। উপাচার্য মশাইদের Special Dish খাইয়ে ম্যানেজারবাবু এই সব বিপত্তি থেকে রেহাই পাবার চেষ্টায় থাকলেও আমাদের স্পাইরা অর্থাৎ কালীপদদাদের গোষ্ঠি আসল ঘটনা ফাঁস করে দেওয়ায় একবার এক বিশেষ উপাচার্য মশাই শ্রী তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় (যিনি আশ্রমের প্রথম পঞ্চ ছাত্রের অন্যতম) বিনা নোটিশে একেবারে দুপুরবেলায় প্রথম ব্যাচে ছাত্রদের মাঝে খেতে বসে গেলেন ফলে ভীষণ বিভ্রাট—সব কিচেন সদস্য যেমন হতবাক-তেমনই আনন্দিত উপাচার্য মশাইকে একেবারে নিজেদের মাঝে পেয়ে। উপরন্তু, সেইরাতে উপাচার্যের দিক থেকে পাওয়া গেল স্পেশাল ফিস্ট—বিষম বিভ্রাট মধুরেণ সমাপয়েৎ দিয়ে সমাধান আনল। এই তিক্ত মধুরতার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান আসত আশ্রম জীবনে।

আশ্রম উপাচার্য ঘরের মানুষ—দৈনন্দিন নিয়মানুবর্তিতার ব্যতিক্রমই তাঁকে বাধ্য করে আকস্মিকে কিচেনে অনুপ্রবেশ—এতেই কিচেন সদস্যরা হতবাক এবং আনন্দিত হয় কিন্তু আশ্রম আচার্য (Chancellor) শ্রী জওহরলাল নেহেরুর কিচেনে অকস্মাৎ পদার্পণ-কে কি আখ্যা দেওয়া যায় এবং তার প্রতিফলন কতটা বিস্ময়কর তা আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করেছিলাম বিশেষ করে পৌষ উৎসবের সময়—দুপুরবেলা খাবার ঘন্টার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী করে উত্তরায়ণ থেকে বেরিয়ে সোজা কিচেনের পাশে গাড়ী থামিয়ে শিশুবিভাগের ছেলেমেয়েদের লাইনের সঙ্গে মিশে গিয়ে সোজা খাবার ঘরে। আমরা কয়েকজন পরিবেশী লাইনের সঙ্গে সিকিউরিটি ছাড়া অবলীলাক্রমে নেহেরুজীকে ঢুকে আসতে দেখে পড়ি কি মরি করে ছুটে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে নাম ধরে সম্বোধন করে হিন্দীতে প্রশ্ন করলেন 'তুমনে বাচ্চোঁকো সাথ খিলাওগি না? আমরা তো তাঁর মুখে আমার নাম শুনে তাজ্জব — আবার বলেন কিনা কিচেনে বসে বাচ্চাদের সঙ্গে খাবেন! উপর্যুপরি বিস্ময়—তৎক্ষণে আমাদের মুশকিল আসান কালীপদদা কিচেন ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। আমরা তার আগেই একটি সুবিধাজনক খাবারের বেঞ্চিতে তাঁকে বসিয়েছি। ম্যানেজারবাবুকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার বিনিময় শেষে আমাকে দেখিয়ে আমার নাম করে জানালেন যে আমি হিন্দী জানি বলে উনি আমাকে দেখেই তাঁর মনোবাসনা ইতিমধ্যেই জানিয়ে রেখেছেন। যতক্ষণ তিনি ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত ততক্ষণে আমরা কালীপদদার সাহায্যে কলাপাতা আনিয়ে টেবিলে পেতে বাটিতে খাদ্য সামগ্রী সাজিয়ে দিয়েছি। কলাপাতা দেখে তিনি তো ভারী খুশী। বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে সকলের সঙ্গে খাওয়া সারলেন। আমরা পরিবেশিকারাই পরিবেশন করলাম। খাওয়া শেষে আমার সঙ্গে বড়দের খাবার ঘরে গিয়ে পরিদর্শন ও কিছু আলাপচারিতা সেরে আবার গাড়ী করে উত্তরায়ণে ফিরলেন। প্রতিদিনই নেহেরুজী উত্তরায়ণে আমাকে তাঁদের খাদ্য পরিবেশনায় দেখেন-নামও জানেন এবং কিছুটা হিন্দী বলতে, লিখতে ও পড়তে পারি তাও জানেন। কিন্তু তাঁর এই প্রখর স্মৃতিশক্তির পরিচয় সেদিনই পেয়ে খুব অবাক হই। ভাবি, প্রতিদিনই দেখা হলেও আমার মত তুচ্ছ মেয়ের নামধাম মনে রাখা কি এত সহজ? তাঁর, এত বড় দেশের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এত তুচ্ছ জিনিষ মনে থাকে কি করে!

এই সব দেখে শুনে ভাবি আমাদের সেই কিচেন ভবনটি কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী। এহেন কিচেনকে কি তুচ্ছ করা যায়? এখন তো বিভাগীয় বিভাজনে গুরুত্ব ও হারাতে বসেছে। আর কোন প্রধানমন্ত্রীর (আচার্য) এই অভাবনীয় কিচেন অনুপ্রবেশ আর না দেখেছি না শুনেছি।

পৌষ উৎসবের কথাতেই মনে পড়ছে ৯ই পৌষের হবিষ্যান্নের কথা। শান্তিনিকেতনের যে কোন উৎসবেই লোক সমাগম ভালোই হত পৌষমেলায় তার মাত্রা অনেক বেশী। কিচেনে দিনে ও রাতে খাওয়ার মাথাপিছু দেড়টাকার টিকিট বাইরের লোকের জন্য সব সময়ই ক্যাশ থাকত। আগে থেকে টিকিট করা থাকলে অসুবিধা হত না—শেষের দিকে এলে কিছু লোককে নিরাশ হতে হত। ৯ই পৌষ একটি বিশেষ দিন-আশ্রমের গুরুজন, বিশেষ ব্যক্তিত্ব, আশ্রমকর্মী, ছাত্রছাত্রী যাঁরা ঐ আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তাঁদের মৃত্যুতিথি হিসাবে ৯ই পৌষ সকালে

এরপর ২৩ পাতায়

বয়ঃসন্ধির অস্থিরতা প্রভাব ফেলছে শিশুমনে

সোমা মুখোপাধ্যায়, কলকাতা

একটা মৃত্যু বহু সময়েই কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে থেকে যায় না বরং সেই মৃত্যু তুলে আনে নানা প্রশ্ন। এক কটিতায় বেআব্রু করে দেয় কিছু অপ্রিয় সত্যিকে। দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীর আত্মহত্যা অনেকটা তেমনই।

বন্ধুর সঙ্গে গোলমালের জেরে ১১ বছরের ছেলে বা মেয়ের নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার নজির কি খুব বেশি মনে করাতে পারে এই শহর? উত্তরটা যদি সত্যটা অনেক কমে। তিনি বলেন, "স্কুল থেকে ফেরার পরে ছেলে বা মেয়ের চোখ-মুখ দেখে খানিকটা আন্দাজ করে নেওয়া যায় যে তার কোনও কিছু নিয়ে বিপর্যস্ত রয়েছে কি না। অমুক স্যার তমুক ম্যাম কী পড়ালেন সেটা জানা যেমন জরুরি, তেমন স্কুলে বন্ধুদের সঙ্গে কেমন সময় কাটল, সে ব্যাপারে খোঁজ নেওয়াটাও খুবই দরকার। অভ্যাসের জায়গা, তার দুঃখের ক্ষত দুটোই বুঝতে হবে।"

মনোবিদদের একটা বড় অংশেই মনে করেন, অভিভাবকদের বোঝার জায়গাটাতেই ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। আগে

'না' হয়, তা হলে প্রশ্ন, কেমন এমনটা ঘটল? অস্থিরতাটা তা হলে সমাজের কোন স্তরে? ঠিক কোন অনিশ্চয়তার বোধ থেকে বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় থাকা একটি মেয়ে এমন চরম পথ বেছে নিতে পারে? তা হলে কি আরও বেশি সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে অভিভাবকদের? যদি তা-ই হয়, তা হলে তা কী ভাবে?

মনোবিদরা জানাচ্ছেন, গত কয়েক বছরেই তাঁদের চেম্বারে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ভিড় বাড়ছে। এদের আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে। নানাভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলে, যন্ত্রণা অস্থিরতার উৎস খুঁজে সেই প্রবণতার উপশম ঘটাতে হয়। মনোবিদেরা মনে করেন, বন্ধু বা সমবয়সী সঙ্গীদের থেকে নানা ধরনের চাপ এখন শিশুমনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করছে। ছোটবেলা থেকেই ওই সব সম্পর্কের ওঠাপড়া তাদের দৈনন্দিন জীবনে ছাপ ফেলছে। আর তা থেকে আসছে আত্মহত্যার চিন্তাও। কারণ সেই চাপটা তারা কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারছে না। ধরেই নিচ্ছে, তাদের সঙ্কটটা বাকিরা বুঝবে না। মনোবিদ রিমা মুখোপাধ্যায়ের মতে, এই জায়গাতেই বাবা-মায়ের ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ। ছেলেমেয়েরা কী পড়াশোনা করছে সে নিয়ে তাঁরা যতটা ভাবেন, তার কয়েক শতাংশও যদি তাদের মন ভাল থাকা না থাকা নিয়ে ভাবেন, তা হলে হয়তো যৌথ পরিবারে ছেলেমেয়েরা অনেকের সঙ্গে নিজের অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারত। এখন সেই সুযোগ নেই। নিজের অনেক মানসিক সঙ্কটেই সন্তান মনে করছে, 'বাবা-মাকে এ সব বলে লাভ নেই। ওরা বুঝবে না।' অভিভাবকদের চ্যালেঞ্জ ঠিক এখানেই। এই ধরনের সমস্যা সমাধানে চালু হয়েছে 'পেরেন্টাল কাউন্সেলিং'। বিদেশে বহু দিন এটা চালু রয়েছে। এ দেশে তো বটেই, এমনকী এই শহরেই এমন ব্যবস্থা চালু হতে শুরু করেছে। যেখানে মূল বিষয়টাই হল, কী ভাবে ভাল ও সংবেদনশীল বাবা-মা হওয়া যায়।

পেরেন্টিং কনসালট্যান্ট পায়েল ঘোষ মনে করেন, সন্তানের সঙ্গে বাবা-মায়ের মানসিক সেতুটা শৈশব থেকেই জোরদার হওয়া দরকার। এ ক্ষেত্রে 'ইমোশনাল ব্যালেন্সিং'টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাফল্য আর ব্যর্থতার পাশাপাশি সন্তান যেন তার বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের ওঠাপড়া বাবামার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে, তাতে জোর দেন তিনি। পায়েলের কথায়, "শিশুদের মধ্যে ভাল কিছু 'ছবি' তৈরি করা জরুরি। এখনকার শিশু আগের তুলনায় বেশি জানে কারণ তাদের 'এক্সপোজার' বেশি। তাদের মনটাকে গঠনমূলক, ইতিবাচক দিকে চালিত করার দায়িত্বটাও বাবা-মায়েরই।"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা

সংক্রমণ আশঙ্কায় আতঙ্কে শহরের ডাক্তাররা

তনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা

এক ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছেন শহরের চিকিৎসকেরা।

রোগ নির্মূল হওয়ার কথা যে সব জায়গায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই হাসপাতাল বা নার্সিংহোম সংক্রমণের আঁতুড়ঘর। শহরের নানা সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে এক রোগের চিকিৎসা করাতে গিয়ে আর এক সংক্রমণে আক্রান্ত হচ্ছেন অসংখ্য রোগী। বিশেষজ্ঞেরা জানান, সেটাই 'নোসোকোমিয়াল ইনফেকশন'।

চিকিৎসকদের একাংশ জানান, হাসপাতালের আইসিইউ, আইসিসিইউ কিংবা আইটিইউ এক-একটা বদ্ধ কামরা। তাদের দরজা-জানলা সবসময় বন্ধ থাকে। রোদ কিংবা হাওয়া কিছুই সেই কাচ ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে পারে না। সর্বক্ষণ চলছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র। এই পরিবেশই জন্ম দিচ্ছে এক ধরনের জীবাণুর। সেই জীবাণু সহজেই অসুস্থ মানুষকে আক্রমণ করছে। তার ফলে রোগীর অবস্থার অবনতি হচ্ছে ক্রমাগত। শুধু রোগীরাই নন, বদ্ধঘরে উৎপন্ন ওই জীবাণু হাসপাতালের চিকিৎসা-কর্মীদের জন্যও স্বাস্থ্য সঙ্কট ডেকে আনতে পারে বলে চিকিৎসকেরা মনে করছেন। এক জন জীবাণু-বিশেষজ্ঞের কথায় ঘরে সূর্যালোক প্রবেশ করতে না পারায় জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুত। তার থেকেও ভয়ের ব্যাপার, ওই সব জীবাণু প্রতিনিয়ত নিজেদের চরিত্র বদল করে ফেলছে। অ্যান্টিবায়োটিকগুলির থেকে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে জীবাণু (মেডিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বা এমডিআর)।

হাসপাতালে আইসিসিইউ-সহ একাধিক বিভাগে সংক্রমক জীবাণুর সক্রিয়তার জেরে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এক জন রোগী হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পরে আর এক জনকে ওই শয্যায় ভর্তির আগে অনেক সময়ে ঠিক ভাবে ঘর এবং শয্যা পরিষ্কার করা হয় না। সেই কারণেই অনেকে একটা রোগমুক্তির জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আর একটি জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিশেষত দুর্ঘটনায় আহত রোগী কিংবা অন্য কোনও জরুরি পরিস্থিতিতে যে সব রোগীকে ভর্তি করতে হয়, তাঁদের কোনও সংক্রামক ব্যাধি রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে নেওয়া আবশ্যক। পাশাপাশি, রোগীর ব্যবহার করা জামাকাপড় এবং জিনিস কতটা পরিষ্কার করা হয়, সে দিকেও নজর দেওয়া জরুরি।

পরজীবীরোগ বিশেষজ্ঞ অমিতাভ নন্দী বলেন, "স্বাস্থ্য-সচেতনতা না বাড়ালে এই পরিস্থিতির বদল সম্ভব নয়। নানা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের নীতি বদল করাও জরুরি। ওষুধের ব্যবহার সম্পর্কে চিকিৎসকদের আরও ওয়াকিবহাল থাকতে হবে।" চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, সংক্রমণ রুখতে আইসিসিইউ-তে ব্যবহার করা ওষুধ নিয়ে গবেষণা জরুরি। পাশাপাশি, হাসপাতালের কর্মীরা ঠিকমতো পরিষ্কার করছেন কি না, সে দিকে নজর রাখতে হবে। রোগীদের খাবার তৈরির জায়গার উপরেও নজরদারি থাকা উচিত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। সম্প্রতি এই নিয়ে একটি কর্মশালারও আয়োজন করেছিলেন কলকাতা শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ।

মেডিকা হাসপাতালের আইসিসিইউ ইন-চার্জ অরিন্দম কর বলেন, "পৃথিবী জুড়েই এখন হাসপাতালগুলি এই সমস্যায় জেরবার। সংক্রমণ রুখতে এলওএস, অর্থাৎ রোগীর হাসপাতালে থাকার দিন কমানো দরকার। অর্থাৎ কী ভাবে দ্রুত রোগীকে সুস্থ করা যায়, সেই বিষয়ে আরও প্রশিক্ষণ নিতে হবে কারণ, যত দ্রুত হাসপাতাল থেকে রোগী ছুটি পাবেন, তত তাঁর সংক্রমণের ঝুঁকিও কমবে।"

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯/৪/১৭)

সময়ে চাল দাও, নইলে জেল যাও

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

সোজা আঙুলে কাজ হয়নি। খাদ্যসাথী প্রকল্পে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে তাই এ বার আঙুল বাঁকাচ্ছে রাজ্য সরকার।

সরকারি ধান চালকলে ঢোকার পরে ১৭ দিনের মধ্যে তা ভাঙিয়ে দিতে হবে বলে নির্দেশিকা জারি করেছে খাদ্য দফতর। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট চালকল মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করে মামলা দায়ের করবে তারা। খাদ্যসচিব মনোজ অগ্রবাল এই নির্দেশ জারি করেছেন।

রাজ্যের খাদ্য দফতর সূত্রের খবর, দু'টাকা কিলোগ্রাম দরে ওই চাল বিলি করা হয় খাদ্যসাথী প্রকল্পে। চালকল-মালিকদের একাংশে সংগৃহীত সরকারি ধান ঠিক সময়ে না ভাঙানোয় ওই প্রকল্প মার খাচ্ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে কড়া ব্যবস্থা চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্দেশে বলা হয়েছে, যে সব চালকলের মালিক ১৭ দিনের মধ্যে সরকারি ধান ভাঙিয়ে চাল দিতে পারবেন না, খাদ্য দফতরের জেলা স্তরের আধিকারিকেরাই তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ জানাতে পারবেন। ফলে এ বার চাল সংগ্রহ আরও দ্রুত শেষ হবে বলে মনে করছেন খাদ্য দফতরের কর্তারা। তাঁদের আশা, কল-মালিকদের একাংশ যে ভাবে সরকারি ধান নিয়ে লেভির চাল দিতে গড়িমসি করতেন, তার অবসান হবে।

"গত বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বার চালকলগুলিকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হল সময় মেনে ধান ভাঙিয়ে চাল দাও। নইলে জেলের ঘানি টানো," বলছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

রাজ্যে এখন প্রায় ১৬০০ চালকল রয়েছে তার মধ্যে প্রায় ৯০০টি কলে ধান কিনে ভাঙাতে দিয়েছে সরকার। চালকলগুলি সরকারের দেওয়া ধান ভাঙিয়ে খাদ্য দফতরেরও দামে পাঠাবে এটাই নিয়ম। কিন্তু অনেক সময়েই চালকল-মালিকদের একাংশে সরকারের দেওয়া ধান ভাঙিয়ে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেন বলে অভিযোগ। কখনও কখনও এক বছরের লেভির চাল সরকারকে দিতে পরের বছরও গড়িয়ে যায়।

এ বার ধান সংগ্রহে নেমে খাদ্য দফতর প্রথমে অনলাইনে শুধু বৈধ পরিচয়পত্র থাকা চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু সেই পদ্ধতিতে বিশেষ সাড়া না মেলায় পরিস্থিতি খতিয়ে সাত সচিবের কমিটি জেলায় জেলায় সফরে গিয়েছিল। তাদের পরামর্শে যে-কারও কাছ থেকে যত খুশি ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সরকার।

কিন্তু এক শ্রেণির চালকল সেই ধান ভাঙিয়ে চাল না দেওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। সেই সমস্যার সুরাহা করতে চালকলগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, "কোনও চালকল মালিক যদি সরকারি ধান নিয়ে চাল না দেন তা হলে ব্যবস্থা নিতে হবে।"

সময় মেনে ধান ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের যে নির্দেশ দিয়েছে, তা অবাস্তব বলে মনে করেন চালকল মালিকেরা। রাজ্য চালকল-মালিক সংগঠনের মুখপাত্র আব্দুল মালেক বলেন, "প্রতিটি চালকলেরই ধান ভাঙানোর ক্ষমতা নির্দিষ্ট। কিন্তু সরকার

এত বেশি ধান দিচ্ছে যে ১৭ দিনের মধ্যে কোনও ভাবেই তা ভাঙিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।" মালেকের বক্তব্য, কোনও চালকলই এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারবে না।

—সৌজন্যে আনন্দবাজার পত্রিকা (১৯/৪/১৭)

মোদীর নির্দেশে লালবাতি ইতিহাস

প্রথম পাতার পর

হয়েই ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিংহ তাঁর রাজ্যে লালবাতি রেওয়াজ বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। কংগ্রেসের বক্তব্য, মোদীর তিন বছর সময় নিলেন এই চটকদার রাজনীতি করতে। এখন তিনি প্রতীকী রাজনীতি করছেন। বিজেপির পাল্টা বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নিজে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর চলার পথে যাতে কারও হেনস্থা না হয়, তা নিশ্চিত করতে।

সৌজন্যে– আনন্দবাজার পত্রিকা। ২০/০৪/১৭

আশ্রমে কিচেন মহিমা

২১ পাতার শেষ

আম্রকুঞ্জে একটি শোকসভা পালিত হয়। ঐদিনে দিনের আহার হবিষ্যান্ন—আমাদের সময়ে ঐ হবিষ্যান্ন ঐ বিশেষ দিনে সব অতিথি বিনা টিকিটেই খেতেন। এখনও হবিষ্যান্ন হয় এই পৌষ কিন্তু টিকিটের খবর সঠিক জানা নেই। এই প্রসঙ্গে ১লা বৈশাখের কথা ও একটু এসেই পড়ে কারণ তা রীতিমত কিচেন সংক্রান্ত। পয়লা বৈশাখের বিশেষ উপাসনা শেষে ছাতিম তলার কাছে শালপাতা পেতে খুরিতে বিশেষ সরবত সহযোগে নানা জল খাবারের সম্ভার সাজিয়ে বহু অতিথি আপ্যায়ন হত। জল খাবারের কিছু বৈচিত্র্য প্রতিবারেই থাকত। সবই ঐ কিচেনেই তৈরী হত। সেখান থেকে এসে পরিবেশিত হত কিচেন কর্মীদের সহযোগীতায়। এ ব্যাপারে আমরা ছাত্রছাত্রীরা ও বিশেষভাবে লিপ্ত থাকতাম।

কিচেনের আরও একটি বাৎসরিক বিশেষ অধ্যায় ছিল নবান্ন/ সকাল থেকেই আনন্দের আমেজ—জলখাবার থেকেই পরিবর্তিত খাদ্যতালিকা। সবই কিচেনের কারসাজী—আর বিকেলের খাদ্যতালিকা সম্পূর্ণ আলাদা নতুন ধান, নতুন গুড়ের মিষ্টি, নতুন গুড় দিয়ে নতুন চালের পায়েস তার সঙ্গে ক্ষীর নারকেলের পুরে ভরা পাটিসাপ্টা নলেনগুড় সহযোগে। এসবের মধ্যেই ছিল আন্তরিকতার ছোঁয়া, মধুর পরিবেশ।

কিচেনের আরও এক বিশেষ পটভূমিকার উল্লেখ করা হয়নি—তার নাম গান্ধী পুণ্যাহ—১০ই মার্চ গান্ধীজি স্মরণে তাঁর সম্মানার্থে এই দিনটি বিশেষভাবে পালিত হত, আশ্রম পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রেখে নিজের সব কাজ নিজেরা করে। সব কাজের মধ্যে কিচেনের কাজটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে একা সম্ভব নয়। সেজন্য যতটা সম্ভব নয়। সেজন্য যতটা সম্ভব ছাত্রছাত্রী মিলে কাজগুলি করত—রান্নাতেও হাত লাগাতেও কিচেন কর্মীদের উপস্থিতি অতি অবশ্যই প্রার্থনীয়—অশীপদ এন্ড কোং, হাতে হাত তৈরী থাকত তবে কিছু কাজে তারা অবশ্যই অব্যহতি পেত। তবে রান্নাঘরে উপস্থিত থেকে রান্নাঘরের একদিনের অতিথি কর্মীদের পরিচালনার ভার মুশকিল আসান দাদারাই নিত। সেদিনটা আমাদের কিচেন ভবনটি আনন্দমুখর হয়ে থাকত। আশ্রমের সবরকম কর্মীরাই কিচেনের অতিথি কর্মীদের কাছে চায়ের আশায় ভক্ষ্যাদির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করতে মোটেই ভুলত না। সব মিলিয়ে সেদিনটা কিচেনে আনন্দের জোয়ার।

এই গান্ধী পুণ্যাহের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এই দিনটি গান্ধীজির সম্মান রক্ষার্থে গুরুদেব নিজে পালন করা প্রচলন করেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রথম থেকেই নিজের কাজ নিজে করবার প্রচলন ছিল ছাত্রছাত্রীদের স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলার জন্য। তবে বাসন মাজা বা আশ্রম পরিস্কার করার কাজ প্রচলিত ছিল না। একবার গান্ধীজি আশ্রমে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে এসে ঐদুটি কাজও সংযোজন করার যুক্তি দেন। গুরুদেব তা মেনেও নেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে দেখা যায় এতে পড়াশুনার মান কিছুটা কমেছে, ছাত্ররা অসুস্থও হয়ে পড়ছে—সেই পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকরা আপত্তি জানান। কবিগুরু নিজেও এই ব্যাপারে মনে মনে চিন্তিত হন—তখনই তিনি আশ্রম পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করে পূর্বোক্ত কর্মসূচী বহাল রাখেন। পরবর্তীকালে ১০ই মার্চ গান্ধীজির সম্মান রক্ষার্থে দিনটিকে গান্ধী পুণ্যাহ রূপে স্বীকৃত করেন।

আমরা তখন পাঠভবনেই আছি—হঠাৎ কানে এল রথীদার ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে whole শান্তিনিকেতনে নিমন্ত্রিত হবে। কিচেনে সকলে সারাদিন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আসবেন—আমাদের সূচীনুসারেই চলবে প্রতিবেলার আহার রাত পর্যন্ত। রথীদা, (গুরুদেবের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমাদের মানে বিশ্বভারতীর উপাচার্য তখন।

যাই হোক, কিচেন কর্মীরা হঠাৎ রান্নাঘর, খাবার ঘর সাফাইয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত, কিচেন ভবনটি ভিতরে বাইরে নতুন রং, এ কাজের পরিবর্তন করে সুন্দরভাবে সেজে উঠল। আশ্রমবাসীরা নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে কিচেনেই আসছেন—আমরা যথারীতি কিচেন ম্যানেজারের তালিকানুসারে পরিবেশন করব—এরকমই ব্যাপার। পাঠক পাঠিকারা বুঝতেই পারছেন

কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
'তাধে ধৈ ধৈ, তাধে ধৈধৈ, তাধে ধৈধৈ।'

এই সব আনন্দের ও নিত্যনতুন পটভূমিকার পিছনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিচেনের ও গভীর দায়িত্ব পালনের একটি ভূমিকা থেকে যায়—তাহল আমাদের অভিভাবকদের মনে আশা পূরণ এবং ছাত্রছাত্রীদের নানা স্বপ্নপূরণের বিশেষ প্রচেষ্টায় সামিল থাকা। ভাবছেন তো? সেটা আবার কি? ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে কিচেন কর্মযজ্ঞে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত বটে আবার সকল বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের নিয়ম ও সময় মত আহার ব্যবস্থাদির নজরদারী খুব জরুরী।

আমাদের সময়ে পাঠভবন ফাইনাল পরীক্ষার্থীরা (Matric) Test এরপর থেকে কিচেনে সারাদিনের খাবারে বিশেষ পরিষেবা পেত। তার জন্য Extra কোন টাকা অভিভাবকদের কাছে নেওয়া হত না। সকালে জলখাবারে পরীক্ষার্থীরা দুধ ও ডিম নিয়মিত পেত পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। দুপুরে ও রাতেও বিশেষ কিছু দেওয়ার রীতি ছিল। এই বিশেষ পরিষেবার ও কর্মাধ্যক্ষ প্রতি বছর কিচেনই বহন করত আলাদাভাবে। কিচেন কাহিনী লিখতে বসে এতদিনে তার গুরুত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। ছাত্রাবস্থায় অনাবিষ্কার, তার সঙ্গে মুস্কিল আসানবৃন্দের সহযোগিতা কিচেনের গুরুত্ব মোটে বুঝতে দেয়নি। মাঝে মাঝে ম্যানেজারবাবুর আক্রমণ আমাদের কিঞ্চিত বিড়ম্বনায় ফেলার চেষ্টায় থাকলেও কিচেনের মুস্কিল আসানবৃন্দ সে গুড়ে বালি ঢেলে আমাদের রক্ষা করত।

কিচেন মহিমা শেষ করি—এখনই বুয়া এসে বলবে কিচেনে আছে কি? যে, শেষ আর হচ্ছে না? আমি বলি—

"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।।"

সৌজন্যেঃ আধুনিক যুগশঙ্খ

চৈত্র প্রেম

অরুন্ধতী সরখেল

চৈতালী সন্ধ্যায়
বসে আছি দুজনায়—
হাতে হাত চোখে চোখ
করি জীবনের যোগ বিয়োগ।
হঠাৎ চৈতালী সুবাসে
স্বপনে শিমুল ভাসে
চৈতী বিয়োগ ভোলে
করে শুধু যোগ।

Planning a Wedding, Anniversary, Birthday Party or Celebrating a Special Occasion?

Consider

Tagore Hall at Ananda Mandir!

This beautiful new facility can meet all your party needs:
Seating capacity, dance floor, well equipped stage, ample parking

***

For information on rental availability and charges
contact the managing agents:

Maureen: (732) 492-5580 or Troy: (732) 343-0082
Email: momonev@aol.com

Rabindra Utsab

On May 20th 2017

at

Ananda Mandir Community Center

269 Cedar Grove Lane, Somerset, NJ 08873

11 am till 11 pm

Organized by:

Cultural Association of Bengal (CAB)

বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ
নিউ ইয়র্ক

and Ananda Mandir

In association with other Bengali community organizations

আনন্দ মন্দির
নিউ জার্সি

Overseas Artists:

Riddhi Bandopadhyay & Kaji Anindita

Attractive local group performances

Admission:
nors: $100 (includes free dinner)
Individual: $20
Children (11 years – 18 years): $10
Children 10 years and below are free

For group performances and tickets pleases contact
Arun Bhowmick – 908 672 1452
Dhriti Bagchi – 732 598 2287
Sushmita Sarkar – 516 817 3846
Tapas Sanyal – 732 688 4597
Vendor Stall will be available for food purchase

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ , নিউ ইয়র্ক

2017 ANNUAL PICNIC

Saturday, August 19, at 11:00 AM

PLEASE MARK ON YOUR CALENDAR AND COME WITH YOUR FRIENDS AND FAMILY

PICNIC AREA WILL BE ANNOUNCED LATER

FOR MORE INFO: SNIGDHA (201-944-0887) & SUSHMITA (516-817-3846)